শনিবারের চিঠি

১৪ ভদ্র ১৩৯২ □ ৩১ আগস্ট ১৯৮৫

কাছে থেকে দেখা দূরদর্শন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান ঃ রূপালী গোশাভী

হার্ডকপি ও এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি-১ ফোনঃ ২৫-১৮৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র-পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রে Exclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার । যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

—আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে

শারদীয়

শনিবারের চিঠি

৩টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

বনফুলের শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস। সম্পূর্ণ করেছেন --
বিমল মিত্র, নবনীতা দেবসেন এবং বিমল কর।
নিমাই ভট্টাচার্য লিখেছেন দ্বিতীয় সম্পূর্ণ উপন্যাস।
তৃতীয় উপন্যাস -- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিশেষ রচনা ঃ অমিতাভ চৌধুরী

রসরচনা ঃ-- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ

পুনশ্চ পর্যায়ে ছোটগল্প ঃ-- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ছোট গল্প ঃ-- আশাপূর্ণা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সমরেশ বসু, সুজাতা ঘোষ, সর্বাণী সোম

কবিতা ঃ-- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আনন্দ বাগচি, অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পূর্ণ অফসেটে মুদ্রিত □ দাম ঃ পনেরো টাকা মাত্র
এজেন্টরা অগ্রিম টাকাসহ এখুনি অর্ডার পাঠান

৩২, গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
কলি ঃ ৭০০০১৩,
ফোন ঃ ২৭-৪৯৪৩

তুমলোগ!
হামলোগ!
SORRY FOR INTERRUPTION
অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় —দুঃখিত
রাষ্ট্রভাষা শিখছি, বাবা!
...আগেই আপনাকে শনিবার, রবিবার সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়িতে দেখা করতে বারণ করে দিয়েছিলাম .....!
তোমার সিনেমার খরচা বাঁচিয়ে দিয়েছি.... তবে কসমেটিকসের খরচা সামান্য একটু বাড়বে!
..যাক টিভি এসেছে.. এবার বাড়ির কাজের লোক পাওয়া যাবে।
প্রায় নতুন টিভি বিক্রি আছে
আঃ বাঁচলাম!

সূচীপত্র

কার্টুন ● ২

চিঠিপত্র ● ৪

বিশেষ রচনা

আর্ট স্কুলের বিদ্রোহী ছাত্র রণদাপ্রসাদ ● তাপস মুখোপাধ্যায় ● ৫

গোসাবা : দুই শরিকের সম্পর্কে চিড় ধরবে কি? ● বিশেষ প্রতিনিধি ● ৩৭

ধারাবাহিক

মরজি মহল ● বনফুল ● ৭

কিছু স্মৃতি কিছু কথা ● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ● ২৭

কারখানার কথাকলি ● প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ● ৪০

প্রচ্ছদ কাহিনী

কাছে থেকে দেখা দূরদর্শন ● প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায় ● ১২

টি ভির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক থাকবেই ● অমলেন্দু কুণ্ডু ●

দূরদর্শন থেকে দূরে থাকুন ● তপন রায়

ফিচার

ব্যক্তিত্ব ● ১১

লালবাড়ির রহস্য ● কমল ● ৩০

বিনোদন ● ৪৪

সংবাদ সাহিত্য ● ৪৬

শিল্প বাণিজ্য

মঞ্জুষা বাংলার মৃতপ্রায় হস্তশিল্পের জীয়ন কাঠি ● অমলেন্দু কুণ্ডু ● ৪২

প্রচ্ছদের ছবি ● চণ্ডী ঘোষ ও দূরদর্শনের সৌজন্যে

অন্যান্য ছবি ● দিলীপ শেঠ ও শিখর কর্মকার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ● আশিষ মুখোপাধ্যায়

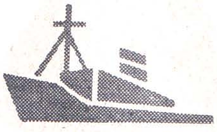

এই সংখ্যায়

আমাদের চলমান জীবনে টি.ভি. এখন প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। টি, ভি. এখন আর বিলাসিতার বস্তু নয়। শিক্ষারও অন্যতম মাধ্যম। এই টি. ভি. আমাদের কতখানি উপকারের ও অপকারের মাধ্যম হয়ে উঠেছে, প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাই তুলে ধরা হয়েছে।

আগামী সংখ্যায়

এককালের স্বনামধন্য ভারতবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী নিজের ভিটেতেই উদ্বাস্তু হতে চলেছেন। বিশিষ্ট শিল্পপতি কে. কে. বিড়লা ওর একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখন দখল নেবার চেষ্টায়। একই ভাবে বামফ্রণ্ট সরকার ওর রিজেন্ট পার্কের বাড়ি ভাড়া নিয়ে দখল নিয়ে আছেন। জ্যোতিবাবু বিষয়টি জেনেও নিশ্চুপ,এই নিয়ে আগামীবারের বিস্ময়কর প্রচ্ছদ কাহিনী

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ কাহিনী সদ্য প্রয়াতা অভিনেত্রী মহুয়াকে নিয়ে এক অপ্রকাশিত কাহিনী। পাঠককে বিস্মিত করবে বলাই বাহুল্য।

বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্পু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত।
কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪১৮৩
দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন ৬১৭৬৭১,

দাম: দু'টাকা

পূর্বাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৩৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চল ও কলকাতা বাদে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৫০ পয়সা

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা
১৪ ভাদ্র ১৩৯২ □ ৩১ আগস্ট ১৯৮৫

সম্পাদক
চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস
সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপক
অরুণাংশু ঘোষ

প্রধান কর্মসচিব
শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা
আশিস মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ
শহীদুল ইসলাম

চিঠিপত্র

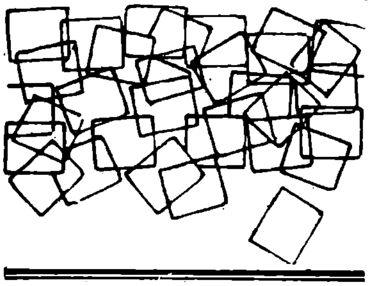

আসাম অসমীয়ার, পঞ্জাব পঞ্জাবীর কিন্তু পঃ বঙ্গ সবার!!

মায়ের মৃত্যুর পরে যাঁকে একফোঁটাও চোখের জল ফেলতে দেখা যায়নি, আবার অভাবিতভাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েও যাঁর একটুও হাসিমুখ দেখা যায়নি, তাঁরই সহাস্য বদনের ছবি খবরের কাগজে দেখা গেল – আসাম সমস্যার সমাধানে। হ্যাঁ, শ্রী রাজীব গান্ধীর কথাই বলছি। হাসিমুখটি দেখে কিন্তু কেমন যেন লাগে – এটা সত্যি হাসি তো? কান্নার উল্টোপিঠ নয়ত? কারণ আসাম সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার তো সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছেন।

সত্যকথা বলতে কি শ্রী রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে চমক লাগানো ঘোষণা করার জন্য তড়িঘড়ি আসাম সমস্যার সমাধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ আসাম সমস্যাটি ক্রমশঃই ঝিমিয়ে আসছিল। এই মুহূর্তে কয়েকটি মাথাগরম তরুণের রাজনৈতিক মতামতকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হয়নি। এতে দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনাই সমধিক। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী চুক্তি সই করলেন কাদের সংগে? এরা কোনো স্বীকৃত রাজনৈতিক দল? ট্রেড ইউনিয়ন? নাকি কিছু জেদি মানুষের গোষ্ঠী? তাহলে ঐ চুক্তির মূল্য কি? তাহলে এটা কি প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকল বিরুদ্ধ না?

১৯৭১-এর পরে যে শিশুরা আসামে জন্মেছে তাদের নাগরিকত্বের দায় কে বহন করবে? এর অন্য কুফল হচ্ছে সমস্যা জর্জরিত পশ্চিম বংগে আবার উদ্বাস্তুর ঢল নামবে। তার কারণ বিহার বিহারীদের, পঞ্জাব পঞ্জাবীদের, আসাম অসমীয়াদের কিন্তু পশ্চিম বংগ সকলের তাই না? এ সমস্যার সমাধান কিসে হবে?

১৯৬৬ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরা হল কোন যুক্তিতে? তাহলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রী মুজিবুর রহমানের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছিল যে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চকে ভিত্তিবর্ষ ধরা হবে, সেই চুক্তিটি কি এখন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যাবে? আবার ভারত থেকে কোনো চুক্তি ছাড়াই হঠাৎ হাজার হাজার মানুষ বাংলা দেশে পাঠালেই কি তারা গ্রহণ করবে? এদিকে আসামেও তাদের থাকতে দেবে না তখন ঐ ছিন্নমূল মানুষগুলি পশ্চিমবংগ ছাড়া আর কোথায় আসবে? ১৯৬৬র পরে যারা আসামে গেছে, শ্রী রাজীব গান্ধীর এই নয়া চুক্তির ফলে তাদের ভোটাধিকার দশ বছরের জন্যে কেড়ে নেওয়া হল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটাধিকার হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার, সে অধিকার খর্ব করার অধিকার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীরও থাকা উচিত নয়।

এখন থেকে আসামে থাকতে গেলে অ-অসমীয়াদের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে – এ কেমন আবদার? অনেক অসমীয়া পশ্চিমবংগ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আছেন, তাঁরা কি নিজস্ব সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়েছেন?

এক কথায় বলা যায় শ্রী রাজীব গান্ধীর এই চমকলাগানো চুক্তি সমস্যাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের ওপর আরো বোঝা চাপিয়ে দিল। কিন্তু বাঙালীর সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান বাঙালী যদি মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি তোলে যে পশ্চিমবংগ থেকে সমস্ত অবাঙালীকে চলে যেতে হবে, তাহলে শ্রী রাজীব গান্ধীর ঐ হাসিমুখটা থাকবে তো?'

সুজাতা ঘোষ
এ ডি-২৮ সল্ট লেক

সম্পাদক
শনিবারের চিঠি,
কলিকাতা

মাননীয় মহাশয়,

৩ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'মহুয়া রায়চৌধুরী' সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি নতুনত্বের দাবী রাখে। বেশ কিছু অজানা তথ্য যা অন্যত্র প্রকাশিত হয় নি, তা উপরোক্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় এই মত প্রকাশিত হয়েছে যে সাংবাদিকেরা এবং পাঠক-পাঠিকারা মহুয়াকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। অনেকের মতে আত্মহত্যার স্বীকৃতি যখন মহুয়া স্বেচ্ছায় দিয়েছেন তখন এ বিষয়ে পুলিশী তদন্ত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সত্যিই কী তাই?

বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে মহুয়া মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিলেন একজন সফল অভিনেত্রী। দাদার কীর্তি, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ এবং তপন সিন্‌হার আদমী আউর আউরত ছবিতে তাঁর অসামান্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর মিলেছে। একজন কর্মব্যস্ত নায়িকা হিসেবে যে মুহূর্তে তিনি পরিচিত হতে যাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিল। তাঁর অসংখ্য অনুরাগী নিশ্চয়ই শোকাহত। সিনেমা জগতের ক্ষতি অপূরণীয়। কিন্তু এর পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আর সে প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে মহুয়ার মৃত্যু রহস্যে। কেন তাঁর এমন মৃত্যু হল? যদি আত্মহত্যাই (!) করে থাকেন তবে তার পেছনে কোন ঘটনা কাজ করেছিল? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন আত্মহত্যার পেছনে হতাশা মানসিক দ্বন্দ্ব,দারিদ্র্য, অপরাধমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি বহুবিধ কারণ থাকে। আমাদের প্রিয় অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে এর কোনটিকেই মেনে নিতে মন চায় না। আমরা চাই মহুয়ার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হোক।

নমস্কারান্তে—
বিনীত —
তাং ১৪. ৮. ৮৫

দেবাশিস ঘোষ।
পেঃ কৃষ্ণনগর
নগেন্দ্র নগর, নদীয়া।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

শনিবারের চিঠিতে সাহিত্যিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' আমি নিয়মিত পড়ি। ১০ই আগস্টের শনিবারে উক্ত ধারাবাহিক লেখাটি না দেখে হতাশ হলাম। গতানুগতিক স্মৃতিচারণ থেকে এই লেখাটি কিছুটা ভিন্ন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে অনেক লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু ভালোবাসা আর ছোটখাট সহায়তায় এই সব বিশিষ্ট মানুষদের ঘিরে যে সব সাধারণ মানুষরা ছিলেন বা আছেন, স্মৃতিচারণে তাঁদের কথার কিন্তু তেমন কোন উল্লেখ থাকে না। এখানে লেখক কিন্তু সেই সব মানুষদেরও কিছু কিছু কথা লিখছেন। এ কারণে লেখাটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণের।

আশা রাখি আগামী সংখ্যা থেকে 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকবে।

নমস্কারান্তে
১৬.৮.৮৫

বিনীতা
শোভনা মিত্র
২০/১ ডি রাজা মণীন্দ্র রোড
পাইকপাড়া
কলকাতা ৩৭

আর্ট স্কুলের বিদ্রোহী ছাত্র রণদাপ্রসাদ

তাপস মুখোপাধ্যায়

তদানীন্তন কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ঐ স্কুলেরই অধ্যক্ষ আরনেট বিনফিল্ড হ্যাভেলের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং স্কুল পরিত্যাগ করেছিলেন। হ্যাভেলের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর স্কুলের ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করে দেশীয় চিত্রকলার অনুশীলন করবে। এরই ফলে ছাত্রদের মনে অসন্তোষ দেখা দিল। একদল ছাত্র রণদাপ্রসাদের নেতৃত্বে আর্ট স্কুল ছেড়ে দিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ শেষে কোন একজনের কাছে মন্তব্য করেছিলেন -- 'ছেলেটি খুবই তেজস্বী'। যে তেজস্বিতা বিবেকানন্দ যা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করেছিলেন তার জোরেই রণদাপ্রসাদ ছাত্রাবস্থায় জুবিলী আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেন। তৈল চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। রণদাপ্রসাদের জন্ম সনের উল্লেখ জানা যায় না। তবু একটি জীবনীমূলক অভিধানে দেখা যায় যে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের পরিবার দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন।

কলকাতা আর্ট স্কুল পরিত্যাগ করার পর বৈঠকখানা রোডে 'জুবিলী আর্ট একাডেমী' প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতা কর্পোরেশন এবং কয়েকজন ধনীব্যক্তি নতুন এই প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক সহায়তা দান করে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে রণদাপ্রসাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ 'জুবিলী আর্ট একাডেমি' হয়। রণদাপ্রসাদের বিখ্যাত ছাত্রদের নাম হল নরেন্দ্রনাথ সরকার, ফণীন্দ্র বসু, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে পাওয়া যায় –

"ছেলেরা রণদাবাবুকে কত ঘনিষ্ঠ - আত্মীয়ভাবে পেয়েছিল–গুরুকে এমনভাবে পাওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও দুরদৃষ্টবশত: তা আমাদের ভাগ্যে জোটে নি বটে কিন্তু এই জুবিলী আর্ট একাডেমীতে ভাগ্যবান্ ছাত্রদের তা জুটেছিল।"

সেই ভাগ্যবান ছাত্রদের যথার্থ অভিভাবক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সরল,শক্তিশালী মানুষ, তাঁর স্বাস্থ্যও যেমন সুন্দর, তেমনি তাঁর মনটিও ছিল সুন্দর। দুর্বলতা রণদাপ্রসাদকে কখনও গ্রাস করে নি। সবাইকে আপন ভেবেছিলেন তিনি। তাঁর কথার যাদুতে অন্যদের কাছে বিশেষ একটি কথা গভীর তাৎপর্য বহন করে আনত। দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ রণদাপ্রসাদ ছাত্রদের বিলিতি জিনিস বর্জনের জন্য উৎসাহ দান করতেন। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় স্বদেশপ্রেমী এই চিত্রশিল্পীর 'রিভোল্টিং' চরিত্রের অন্যতর একটি দিক তুলে ধরেছেন--' ....কিন্তু ক্যান্‌ভাসটাও ছিল বিলাতি, বর্জনের দিনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রণদাপ্রসাদ বিলাতি ক্যান্‌ভাস কেমন করে ব্যবহার করবেন ?

তিনি করলেন কি, একটু ঘন বুননওয়ালা পাটের থান অর্থাৎ চট এনে ব্যাকফ্রেমে যথারীতি স্ট্রেচ করে নিয়ে তার উপর অয়েল কালার চাপাতে আরম্ভ করলেন–ছেলেরা দেখে অবাক।'

প্রিন্সিপালের খেয়াল হলেও ছেলেরা কেউ তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে নি। রণদাপ্রসাদের সহধর্মিনীও তাঁর একটি ছবিতে ধরা দিয়েছিলেন। রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে পোশাকের ক্ষেত্রে ঢিলে ঢালা পোশাক পছন্দ করতেন। 'মূর্তিমান এনার্জির ' উৎস রণদাপ্রসাদ প্রচন্ড কর্মস্পৃহা ও উদ্যমের সাহায্যে স্কুলকে দাঁড় করিয়েছিলেন। চরিত্রের বলিষ্ঠতার গুনে রণদাপ্রসাদ অন্য সকলকে খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন। 'বন্ধুবাৎসল্য', 'শিষ্যবাৎসল্য' 'অনুগত বাৎসল্য' -- এই ধরনের গুণাবলী রণদাপ্রসাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোভাবে জড়িয়েছিল। চিত্রকলার সবকটি শাখাতেই তাঁর অধিকার থাকলেও প্রতিকৃতি চিত্রকলার ক্ষেত্রে খ্যাতি বেশি ছিল। শশিকুমার হেশ তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদদের মধ্যে ছিলেন। রণদাপ্রসাদের সঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় নিবিড় ছিল। সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে রণদাপ্রসাদ 'বঙ্গমাতা' ছবিটি আঁকেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎকারের চিত্রটি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে আছে। বিবেকানন্দের শিল্পকলা বিষয়ে প্রগাঢ়জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে রণদাপ্রসাদ বিস্মিত হয়েছিলেন। এই আলোচনার সময় রণদাপ্রসাদ তাঁর স্বভাবের বিনয়টুকু তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'কালী দি মাদার' কবিতাটির ভাব ছবিতে প্রকাশ করার কথা বলেছিলেন। এই বিষয়ে 'স্বামী শিষ্যসংবাদে' বলা হয়েছে -- "শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তিনি দেখিয়াছিলেন, রণদাবাবু বাড়ি ফিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তান্ডবোন্মত্ত চন্ডীমূর্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ হয় নাই এবং স্বামীজীকে দেখানোও হয় নাই।"

বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের কাছ থেকে

শিল্পকলাবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা শোনার পর রণদাপ্রসাদ উপকৃত হয়েছিলেন। এরপর বিবেকানন্দ শিল্পকলার সার কথা ও সর্বোচ্চ ভাবের বিষয় রণদাপ্রসাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন। বিনয়ী রণদাপ্রসাদ বিবেকানন্দের মূল্যবান বক্তব্য শোনার পর নিজে কিছু বলার অসামর্থ্য জানান। রণদাপ্রসাদের নবীন আর্ট স্কুলের প্রথম বার্ষিক সভায় অনেক রাজা, মহারাজা, বিচরপতিরা সমবেত হয়েছিলেন। একজন পাদরী এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মদ্রাজ টাইমস্ পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য থাকলেও রণদাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠক্রমের পরিচিতিও ঐ মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছিল। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের প্রস্তাবিত ছবিটির অন্তর্গত অর্থের বিষয় রণদাপ্রসাদকে তা ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন। এরপর স্বামীজী অনবদ্য ভাষায় ঐ সীলমোহরের অর্থ বুঝিয়ে দেন। সীলমোহরের অন্তর্নিহিত প্রতীকের অর্থ হল:

"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি — কর্মের; কমলগুলি ভক্তির; এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুন্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক; আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ — পরমাত্মা অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় — চিত্রের ইহাই অর্থ।"

প্রতীকটির ব্যাখ্যা পড়ে শংকরীপ্রসাদ বসুর মতো শ্রদ্ধেয় গবেষকের মনে হয়েছে 'স্বামীজীর রামকৃষ্ণ দর্শনের চিত্রসূত্র'। বিস্মিত রণদাপ্রসাদ ঐ ব্যাখ্যা শুনে বলেছিলেন — "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।" রণদাপ্রসাদকে স্বামীজী এরপর ভবিষ্যৎ বেলুড়মঠ ও মন্দির নির্মাণের চিত্র ড্রয়িং ব্যাখ্যা করে তাঁর ধ্যানধারণাকে ব্যক্ত করেন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির পারিবারিক সংগ্রহে তাঁর আঁকা ছবি ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থেও তাঁর আঁকা ছবি ছিল।

রণদাপ্রসাদ চরিত্রে অহংকার ও আত্মপ্রচারের তৎপরতা বিন্দুমাত্র ছিল না। দুটি দশক ধরে চলার পর জুবিলী আর্ট একাডেমীর বিলুপ্তি হয়। এরপর রণদাপ্রসাদ যাদবপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯২৭ সালে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত পরলোক গমন করেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র বাগল বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন:

"A real lover of Art, Ranada Prasad, though a student, conducted the school with a great zeal and courage rarely to be found in young men of little or no experience."

ইতিহাসবিস্মৃত বাঙালী জাতির কাছে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের কর্ম ও সাধনাকে পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। □

ঋণস্বীকার:

১. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৫ম) শংকরীপ্রসাদ বসু ২. ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী – কমল সরকার ৩. স্বামী-শিষ্য সংবাদ – শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ৪. History of the Govt. College of Art and Craft—Jogeshchandra Bagal ৫. প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ROOFFELT (INDIA)

Manufacturers of

Hessian Based Bituminous water proofing Felt as per IS : 1322/70, All types & Grades

"ROOFFELT"
"PINKY CHINKY"
"TIP—TIP"

H.O. & Sales office

131 B. K. PAUL AVENUE
CALCUTTA—700 005
PHONE 54-5283, 54-1483

NILIMA INTERNATIONAL

Manufacturers of

Industrial Grade (Blown) Bitumen as per IS : 702/68

Grades :— 90/15, 85/25
115/15, 30/40
10/20, 20/30

AND ALL OTHER'S BITUMINOUS PRODUCTS

Factory & Works

VILL: ALAMPUR, NEW KOLRA
ANDUL . HOWRAH
N.H.—6

We also undertake Waterproofing & Dampproofing Jobs.

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

॥ ১ নভেম্বর–১৯৭৬ ॥

লীলাবতী, ইহলোকে আজকাল বিদেশের প্রধান খবর ও কাগজের ঘোঁট কি—তা শোন।

(১) আমেরিকায় ফোর্ড জিতবে না, কার্টার জিতবে।

(২) চীনে মাও-সে-তুং-পত্নী হুয়া, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমাধি, গৃহযুদ্ধ, চীন সমস্ত কেরিয়া গ্রাস করতে চায়

(৩) ফারাক্কার ঝগড়া মেটে নি এখনও। ঈশপের সেই গল্পটি মনে পড়ে। একটি সর্পশিশু শীতে মরমর হয়ে পড়ে আছে দেখে এক ভদ্রলোক তাকে তুলে এনে শেকটেক দিয়ে চাঙ্গা করলেন। চাঙ্গা হয়েই সর্পশিশু ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়াল।

(৪) Anti-ইন্দিরা এবং Pro-ইন্দিরার লড়াই এখনও চলছে। ইন্দিরা সংবিধান বদলাচ্ছেন। ইলেকশন এক বছর পেছিয়ে গেল।

(৫) ভদ্রলোকেরা এখনও মর-মর

পরলোকে এসব খবর
পৌঁছয় কি কিচ্ছু?
ইহলোক তেমনি আছে
ঠিক তেমনি বিচ্ছু।

॥ ২ নভেম্বর–১৯৭৬ ॥

ওপরের ঘরে চুনকাম
শেষ হয় নি এখনও
নীচের ঘরে আছি এখন
উদ্বাস্তুর মতন
কোথায় কোন জিনিস আছে
নাইক তার ঠিকানা
তুমি কিন্তু সঙ্গে আছো
এইটেই সান্ত্বনা
তুমি যদি সঙ্গে থাকো
হোক না সঙ্গোপনে
যেতে পারি বনে।
রনতু আর একটা কাজ পেয়েছে
কাটোয়ায় ব্রিজ করবে
অজয় নদের উপর
আমার কোমরের ব্যথা
একটু যেন কম।
অর্জুনের জ্বর হয়েছে
তার রক্ত পরীক্ষার জন্য
পাঠিয়েছি।
আরও ছটা
গোলাপ গাছ
পুঁতেছি পরশু।
আর কোনও খবর
আপাতত নেই আজ।

॥ ৩ নভেম্বর–১৯৭৬ ॥

এখনও বিব্রত আছি অতি
ওগো লীলাবতী,
চুনকামের ঝামেলা সকল
পুরোদমে এখনও সচল
বাঁশ রং রশারশি
ক্রমাগত ঘষাঘষি
চলিতেছে সারাদিন
বিরক্তি অশ্বের পৃষ্ঠে লাগাইয়া জিন
মন মোর বিবাগী হইতে চায়
কিন্তু হায়
পারে না সে যেতে
সংসার বঁড়শিটা কন্ঠে আছে গেঁথে।

এবার গদ্যে কিছু খবর শোন।

(১) পরিমল তোমার আগেই মারা গেছে খবরটা তোমাকে বলি নি। কাল তার সম্বন্ধে কিছু বললাম রেডিওতে 'শ্রবনী' পরিমল গোস্বামী সম্মান সংখ্যায়।

(২) কাজি নজরুলও মারা গেছে। বাংলাদেশের সরকারি কাগজে আমার একটা কবিতা চেয়েছিল। ৮/১০ লাইন একটি কবিতা এসে নিয়ে গিয়েছিল তারা। কাল এর জন্য ১৫০ দক্ষিণা পাঠিয়েছে।

(৩) অর্জুনের জ্বর হচ্ছিল। রক্ত পরীক্ষা করালাম। কোনও দোষ নেই। Lungs X-Ray করিয়েছি। এখনও Report আসে নি। তাতেও বোধহয় কিছু পাওয়া যাবে না।

॥ ৪ নভেম্বর–১৯৭৬ ॥

লিখতে বসেছি এমন সময়
তিস্তা এল।
'কি করছ দাদু—'
'দিদাকে চিঠি লিখছি। তাকে
আসতে লিখব–?'
'লেখো। আর এলে তাকে ফুলঝুরি,
বেলুন, আর লজেন্স কিনে দিও।
কেমন? দেবে তো?
'দেব।'
তার মায়ের ডাকে তিস্তা
নেবে গেল নীচে।

লজেন্স বেলুন আর ফুলঝুরি
তিস্তার মন করে চুরি
তোমারও করে কি?
আমার তো করে—
যদি ফিরে আসতে পারো
নিশ্চয় কিনে দেব।

কিন্তু একটা সমস্যা
তোমাকে তখন চিনতে পারব তো?
কি বেশে আসবে তুমি?
লিলুটুর সেই হাসি
সেই অদ্ভুত চোখ দু'টি
চোখের সেই অপূর্ব দৃষ্টি
সৃষ্টি করবেন কি আবার কোন স্রষ্টা?
আমি কিন্তু করছি মনে মনে
কিন্তু যাকে করছি
সে লজেন্স, বেলুন বা ফুলঝুরি চায় না

আজ কাগজের প্রধান খবর কার্টার জিতেছে। আমেরিকার অতি-বস্তুতান্ত্রিক লঝঝড় গাড়িটা আশা করি এ গাড়োয়ান ভালই চালাবে।

।। ৫ নভেম্বর-১৯৭৬।।

রন্তু কাটোয়ায় একটা কাজ পেয়েছে। সেখানে অজয়ের উপর 'ব্রিজ' করতে হবে। রন্তু আজ সেখানে মোটরে করে গেল জায়গাটা দেখতে। তারপর রাত্রে আজ অসীমের কাছে বর্ধমানে থাকবে। কাল ফিরে আসবে।

মনে মনে একটু চিন্তিত হয়ে আছি। তুমি থাকলে আরও বেশী চিন্তিত হতে। চিন্তার হাত থেকে তুমি নিস্তার পেয়েছ।

বেঁচে থাকলে বহু বখেড়া।
নানারকম বাঁকা ত্যাড়া সমস্যার হই সম্মুখীন
কখনও খোসামোদ করি
কখনও বা উচাই সঙীন।
হা হা করে হি হি করে
ক্রন্দন বা হাস্য করি
তারপর পটাৎ করি
তুলে ফেলি পটোল
মিটে যায় গোল।
নূতন কোন গোলক-ধাঁধায়
ছিটকে পড়ি কি না
সে কথা জানি না।
কহ কহ সখি
তুমি জেনেছ কি?

।। ৬ নভেম্বর-১৯৭৬।।

আরও অনেক লীলা পৃথিবীতে ছিল, ভবিষ্যতে আরও অনেক থাকবে। বর্তমানেও অনেক আছে বোধ হয়। কিন্তু আমার পক্ষপাতিত্ব একটি লীলার প্রতি। যে লীলা এখন নেই। কোথায় আছে জানি না, তার কথাই অহরহ ভাবছি।

এ পক্ষপাতিত্ব হয় কেন? হয় কারণ আমরা মানুষ। সব হাতীরই যেমন শুঁড় থাকে সব মানুষেরও তেমনি পক্ষপাতিত্ব থাকে। পক্ষপাতিত্বহীন মানুষ দেখি নি। মানুষ নিক্তির ওজনে সবাইকে ভালোবাসতে পারে না। তার মন পছন্দ-অপছন্দের দোলায় সর্ব্বদাই আন্দোলিত-তাই নিক্তির কাঁটা সব সময় দুলছে। তাই তোমার কথা ভাবছি এবং ভাবব। অন্য লীলারা যদি রাগ করে করুক।

একটা খবর শোন। কাল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ছবিখানা পড়ে গিয়ে কাঁচ ভেঙে গেছে।

আমি একই কথা তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করছি আমার লীলা কোথায়, কেমন আছে সে?

ছবি নিরুত্তর। শুধু ছবি। নয় দ্রষ্টা নয় কবি।

করুণসুরে ঘুঘু ডাকছে একটা।

।। ৭ নভেম্বর-১৯৭৬।।

আজ সকালে কবু আর ঊর্ম্মি এসেছিল। কবু এনেছিল দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ আর ঊর্ম্মি এনেছিল Spot কলম। এসেছিলেন ডঃ বীরেন ভট্টাচার্য, তোমার জন্য রঙগন ফুল আর তিস্তার জন্য 'টফি' নিয়ে। যে তুমি এই সমস্তর আকর্ষণ-কেন্দ্র সে তুমি আজ ইহলোকে নেই। কল্পনা করছি স্বর্গে আছ, কল্পনা করছি তুমি পরলোকে আনন্দে আছো। এসব কল্পনা করছি, কারণ কল্পনা করে সুখ পাচ্ছি। সুখ পাচ্ছি বলেই রোজ পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছি তোমার উদ্দেশ্যে। তুমি তা পড়ছ কিনা, অনুভব করছ কিনা জানি না।

জানি না,
কিন্তু তাহা, স্বীকার করি না
অজানার অন্ধকার আলোকিত করি
কল্পনার দীপালী সাজায়ে।

যে ফেরিওলার কাছে তুমি রোজ কলা কিনতে সে হেঁকে যাচ্ছে।

।। ৮ নভেম্বর-১৯৭৬।।

লীলা,

মজার খবর শোন একটা। ম্যাকনামারা তিনদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনদিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত কলকাতা খুঁটিয়ে দেখে গেলেন। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন না কি। বলে গেছেন-ভয় নেই, এগিয়ে যাও, পয়সা দেব কিছু। আনন্দবাজার পত্রিকা আরও মুগ্ধ হয়েছে। রিপোর্টারদের ঘাম দুগ্ধ হয়ে ঝরে পড়ছে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যতক্ষণ আমরা রাশিয়ার বাহুবন্ধনে বাঁধা থাকব ততদিন আমেরিকা আমাদের আলিঙগন করবে না। নেউলকে বুকে নিয়ে বসে আছি, সাপ সেখানে আসবে কি করে।

লীলাবতী ওগো লীলাবতী
স্বর্গে তুমি সুখে আছ অতি
জানি না মোদের ভাগ্যে
লেখা আছে কোন সে দুর্গতি।

।। ৯ নভেম্বর-১৯৭৬।।

আজ শরীরটা ভালো নেই। গায়ে ব্যথা, একটু সর্দি-সর্দি ভাব। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার ছোঁয়াচ লেগেছে। লিখতে পড়তে ইচ্ছে করছে না। কুমারেশ এসেছিল। সে আমার চূড়ামনি রসার্ণব' ছাপছে। তার প্রুফটা দেখাতে এসেছিল। কার্তিক মাস শেষ হতে চলল, রোদ কিন্তু এখনও চড়চড়ে। জ্যোতিষীরা বলেন কার্তিক মাসে সূর্য নীচস্থ হয়ে থাকেন। নীচস্থ হয়েছেন বলেই বোধহয় এ রকম ব্যবহার করছেন। প্রতাপী লোক যদি নীচ হয় তাহলে ভারি মুশকিল।

তোমার ছবিটি আমার দিকে চেয়ে আছে। কি যে বলতে চাইছে জানি না। কখনও মনে হচ্ছে—আমি নেই, তুমি বেশ তো আছ। আবার কখনও মনে হচ্ছে, চোখ ছলছল করছে তোমার।

আজ কাগজ পড়ি নি।

মনে হয় এখনও ম্যাক্‌নামারাই চলছে।

।। ১০ নভেম্বর-১৯৭৬।।

লীলাবতী, কেমন আছো, কোথায় আছ, আমাদের মনে আছে কিনা—এসব জানতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার উপায় নেই।

আকাশের চাঁদকে
আয়ত্তে পেয়েছি মোরা
মঙ্গল গ্রহে গিয়ে
হয়ে গেছে মাটি খোঁড়া

কিন্তু মৃত্যুর পর কি হয় তার সঠিক খবর কেউ জানে না আজও। অনেক রকম কল্পনা করে, কিন্তু সে সব সত্যি কি?

যাইহোক—একটা খবর শোন। পৃথিবীর ধনী জাতগুলো আমাদের উন্নতি করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সবাই বলছেন আমাদের কাছে ধার নিয়ে তোমাদের দেশের উন্নতি কর। ধারে আমাদের মাথার চুল বিকিয়ে গেছে। ওরা বলছে—আরও ধার নাও। আমরাও ধার নেওয়ার জন্য উদ্বাহু।

ম্যাকনামারা এসে গেছেন-এবার Multi National আসছেন। সেকালে আগা ছিল, এরাও আগা, কিন্তু বাঘা বাঘা।

।। ১১ নভেম্বর-১৯৭৬।।

লীলা,

'দুই সমুদ্র' বলে একটা ছবি এঁকেছিলাম অনেকদিন আগে, ভাগলপুরে। মনে আছে তোমার? তার সমুদ্রটা কাল বদলে দিলাম। তুমি থাকলে বলতে পারতে—এ সমুদ্রটা কেমন হল। তোমার ছবির সামনেই রেখে দিয়েছি ছবিটা। কিন্তু আমি জানি তুমি আর কোনও মন্তব্য করবে না। আমাদের সম্বন্ধে হয়তো তুমি নিস্পৃহ হয়ে গেছ।

বাগানে আজ নূতন গোলাপ ফুটেছে Advocate। Golden fairy : E. G. Hill- এদেরও কুঁড়ি ধরেছে। কিন্তু শীত এখনও পড়ে নি' তাই মনে হয় গোলাপ এবার ভালো হবে না। তুমি হয়তো নন্দন বনে পারিজাতের খবর রাখছ।

।। ১২ নভেম্বর-১৯৭৬।।

আমার সুখ আমার অনুভূতিতে
তোমার সুখ তোমার
এই দু'রকম অনুভূতি
যখন এক সুরে বাজে
তখনই প্রেম
তখনই মিলন।
এ প্রেম এ মিলন কি সম্ভব?
এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।
তবু যেন মনে হয়
মনে মনে জানি
তোমার মুখের গান
আমার বীণার তারে
অপরূপ ঝঙ্কারে
বেজেছিল বারে বারে
মুগ্ধ করি মোর হিয়াখানি।

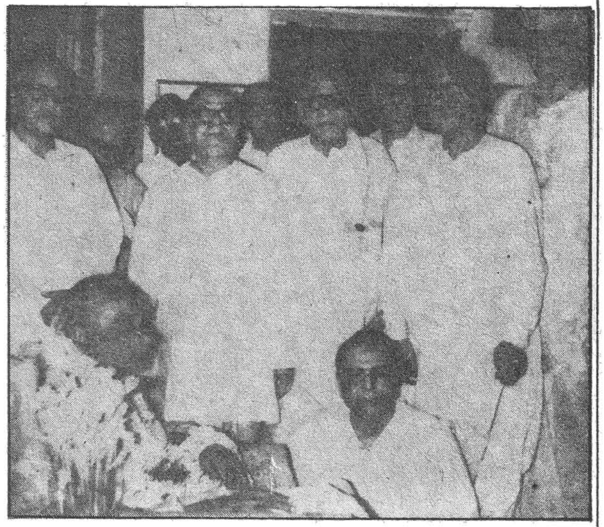

নাই এর কোনই প্রমাণ
তবু জানি আমার এ
সত্য অনুমান।
ওগো লীলাবতী
তুমি ছিলে সেকালের সতী।

।। ১৩ নভেম্বর-১৯৭৬।।

খিঁচড়ে আছে মন
　　আর বিগড়ে আছে প্রাণ
চুণকামের কাজ এখনও
　　হয় নি অবসান।
দশ বারোটা অচেনা লোক
　　আশে পাশে করছে ঘোরাঘুরি
কারো হাতে বুরুশ, চুণ টিন এবং
　　কারো হাতে খুরি
ছবি-টবি পেড়ে সব
　　করছে একাকার
পুরোনো সব চিঠির তাড়া
　　হঠাৎ হঠাৎ হয়ে পড়ছে বার।
তোমার ছেলেমেয়েরা সব
　　যে সব চিঠি লিখেছিল তোমায়
আজকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল হায়
কোথায় তাদের রাখি বল
　　লাগছে বিষম দায়।
West paper Basket-এ
　　ফেলে দিলাম শেষে
ওরাও ভেসে ভেসে
　　চিতায় উঠবে শেষে।
তোমার চিঠি তোমার কাছে ছিল
　　এখনও তাই থাক্‌
　　তোমার কাছেই যাক।

কাগজ পড়বার সময় পাই নি। নিরঞ্জন এসে আজ ৪০০্ এবং একটা গোলাপ গাছ দিয়ে গেল।

।। ১৪ নভেম্বর–১৯৭৬ ।।

কেউ বলছে দেখুন সার
কেউ বলছে দ্যাখ দ্যাখ
কেউ করছে বর্ক বকুম
কেউ করছে প্যাঁক প্যাঁক
আজব শহর কলকাতার
নানা রকম প্রাণী
আমার ছোট ঘরে এসে
খোঁজেন দানাপানি
আমরা লীলা গরীব মানুষ
কোথায় পাব অত
মাথা চুলকে মুচকি হেসে
খাচ্ছি থতমত
কেউ চান উপন্যাস
কেউ চান গল্প
দক্ষিণা কিন্তু তারা
দেবেন অতি অল্প
সভায় যেতে হবেই হবে
আর একজনের দাবী
সরস্বতী মূর্চ্ছা গেলেন
এবং খেলেন খাবি।

।। ১৫ নভেম্বর–১৯৭৬ ।।

আজও যথারীতি বেলা ন'-টায় উঠেছি। প্রাতঃকৃত্য সেরে দশটা নাগাদ লেখার টেবিলে এসে বসলাম। বাইরে মিস্ত্রিরা দেওয়াল ঘসছে। খবরের কাগজ ওলটালাম। সবই বিজ্ঞাপন এবং আত্মবিজ্ঞাপন। তোমার ছবির দিকে চাইলাম। কাল যেমন দেখেছিলাম আজও তেমনি। ছবি বদলায় না। একজন গ্রীক কবির গল্পে পাথরের মূর্তি জীবন্ত হয়েছিল পিগম্যালিয়মে। আমার বেলা তা কি হবে? জানি, হবে না। তবে কল্পনালোকে তুমি আমার চোখে জীবন্ত।

যে লীলাবতীকে আমি
সৃষ্টি করছি মনে মনে
আঁচল তার আকাশেতে
সুষমা তার ফুল-বনে।

।। ১৬ নভেম্বর–১৯৭৬ ।।

লীলাবতী, কেমন আছ গো?
মোর অবস্থা বেশ কাহিল
ঘরে ছুতোর মিস্ত্রি ঢুকেছে
ঠকাঠক্ শব্দ করে ঠিক করছে খিল

আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সব খবর বেরিয়েছে তার শিরোনামাগুলো শোন

(১) বেবিফুড টিনের দুধ, উধাও

(২) ভারত ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে।

(৩) আত্মহত্যা, হত্যা, এবং অপঘাতে লোক জখম হয়েছে।

(৪) সি. পি. এম ২৪ টি কমিটি ভেঙে দিয়েছে।

(৫) Advocate General গৌরী মিত্র মারা গেছেন।

(৬) শুরুতে হলদিয়ায় বড় জাহাজ আসা অসুবিধা।

এসব খবরে জনগণ খুশী হন। তাই ছাপা হয়। তাই বিক্রি হয় কাগজ। তবে আমি নির্বিকার লোক। কারণ আমরা দলছুট। হতচ্ছাড়া, অসামাজিক, escapist, হয়তো তাই। কিন্তু Snob নই, চোর নই।

শাকান্ন খাইয়া মোরা পলান্নের তুলিয়া উদগার
শালা বলি পত্নী-ভ্রাতাকে অন্যদের করি নমস্কার।

।।১৭ নভেম্বর ১৯৭৬ ।।

নতুন যে গোলাপ গাছগুলো লাগিয়েছি এ বছর তার সবগুলোতেই কুঁড়ি হয়েছে। কিন্তু তেমন আনন্দ হচ্ছে না, কারণ তুমি নেই। সত্যিকার সমজদার, জীবনে পাব কি আর? আশা নেই। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতার খবরগুলো পড়ে আর পড়লাম না। শোনঃ

(১) সি পি আই অন্যের ব্যাপারে 'নাক না গলালেই' ভালো। পলিটিকস মানেই তো পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে কিছু হাতিয়ে নেওয়া।

(২) বাস-মিনিবাসে ব্যাংকের বহু টাকা অনাদায়ী। ওগুলো ভোটপাবার জন্য ঘুস।

(৩) শিল্পোন্নয়নে এ রাজ্যে তেমন কাজ হয় নি। হবে কি করে? শিল্পীর জাত আমরা শিল্প করি, ব্যবসা করি না। ব্যবসা করবেন গভর্নমেন্ট। এ দেশে করছেন দুর্নীতিপরায়ণ ধনীরা।

তাই ছবি মানে স্তন-নিতম্ব-হেঁয়ালী
কবিতা পড়লে মনে হয় ডাকছে খ্যাঁক শেয়ালী।
প্রকৃত শিল্পী ও সাহিত্যিকরা খেতে পান না।

।। ১৮ নভেম্বর ১৯৭৬ ।।

মৌলানা ভাসানি ৯৬ বছর বয়সে মারা গেলেন। তিনি ভারতের বা হিন্দুদের হিতৈষী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে আমরা খুব শোকগ্রস্ত হব এটা আশা করাই অন্যায়। এতদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে সব খেলা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তবু তাঁর আল্লা তাঁর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করলেন না। তাঁর 'হজ' করা হল না। তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ছিলেন। স্ত্রীর বয়স কত কাগজে লেখে নি।

লীলাবতী মৌলানা সাহেব তোমাদের দেশের লোক ছিলেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে জন্ম।

প্রথমে ছিলেন ধর্ম-নেতা
পরে হলেন কৃষক
হয়ে গেলেন কমিউনিস্ট
কিন্তু শেষতক
আরও হয়তো দেখাতেন
নানান কসরৎ
মরে গেলেন কিন্তু হঠাৎ
উল্টে গেল রথ।

এতদিনের এই রাজনৈতিক যোদ্ধাকে শেষ সেলাম জানালাম। তিনি যে যোদ্ধা ছিলেন এতে সন্দেহ নেই।

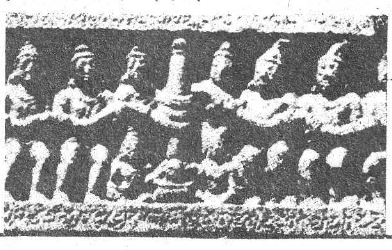

অনুশীলা চ্যাটার্জী

সুরের বোধহয় সুরার চেয়ে মাতাল করার ক্ষমতা বেশী। শেষেরটাতে একজন নেশাগ্রস্ত হন আর সত্যিকারের শিল্পী সুরের আগুন জ্বালিয়ে দেন প্রাণে প্রাণে। ভালো গাওয়ার জন্য দরদদিয়ে গাওয়ার জন্য গান তখন শুধু শিল্পীর নিজের নয়, সকলের সব শ্রোতার। তাই গান শেষ হলেও রেশ থেকে যায়, আরো পাবার আশায়। পরিপূর্ণ করে পাবার আশায়।

অনুশীলা চ্যাটার্জী রবীন্দ্র সংগীতের এক উঠতি শিল্পী। আগামী দিনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিদের অন্যতমা। অনেক দূর এগিয়েছেন। ওঁর গলায় সুর আছে, চোখে **স্বপ্ন** আর বুক ভরা আশা সার্থক **শিল্পী হবার**। রবীন্দ্রসংগীতের এই শিল্পী গানের পাঠ নিয়েছেন অমিয়া রায়, অমল সরকার আর বাণী ঠাকুরের কাছে। এছাড়া গণসংগীত ও নজরুল গীতিতেও তিনি পারদর্শী। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত রূপ-রস-বর্ণ গন্ধ নিয়ে হাতছানি দেয় অনুশীলার চেতনার গভীরে, সত্তার নিবিড়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ আইনের স্নাতক অনুশীলা এখন গবেষণা করছেন ডঃ দুর্গেশ গাঙ্গুলীর কাছে। তাঁর গবেষণার বিষয় "Judicial Supervision of labour laws." তাঁর ছাত্রজীবন শুধু কৃতিত্বপূর্ণই নয় গৌরবোজ্জ্বলও বটে।

খেলাধুলোতেও তিনি চৌকশ। ইউনিভার্সিটিতে টেবল টেনিস কম্পিটিশনে রানার্স হয়েছেন। আর কলকাতার ফুটবল মাঠে তাকে অতি অবশ্যই দেখা যাবে, তিন প্রধানের একটির যখন খেলা থাকে। মোহনবাগানের গোঁড়া সমর্থক পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমহলে "মোহনবাগানের মেয়ে" নামে তিনি পরিচিতা।

কিন্তু গানের আকর্ষণ তাঁর কাছে অমোঘ। ছবিতে গান গেয়েছেন "অজান্তে" "ভালবাসা" আর "অরণ্যের ডাক" ছবিতে। শেষেরটি পরিচালক তরুণ মজুমদার। সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নাচের সঙ্গে তাঁর গান "হৃদয় আমার নাচেরে", ১৯৮৪-র জুলাই-এর এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনের পরিবেশ সংগীতঘন করে তুলেছিল। অকুণ্ঠ সাধুবাদ পেয়েছিলেন সমবেত শ্রোতাদের কাছ থেকে। সংগঠক হিসেবে অনুশীলার পরিচিতি আছে। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। গতবছর নেতাজী স্টেডিয়ামে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন লতা মুঙ্গেশকর। স্টেজের অন্তরালে তাঁর সুনিপুণভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা লতাজীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ও উনি ওঁকে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করেন। তরুণী অনুশীলা তরুণদের সুযোগ দেবার জন্য করেছেন "মিউজিক সার্কেল" আর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন বেশ কিছু তরুণ শিল্পী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী হলেও সাহিত্য বিশেষত কবিতা ঝড় তোলে তার শিল্পীসত্তায়। ইয়েটস, কোলরিজ, শেলীর তিনি ভক্ত। আর রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের অনেক কবির রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুকান্ত, সুভাষ মুখার্জী তাঁকে ভাবায়। ভারত বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও পার্লামেন্টিরিয়ান নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী তাঁর দাদু আর বাবা আরেক দিকপাল ব্যারিস্টার সোমনাথ চ্যাটার্জী। তাই অনুশীলাকে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে হাইকোর্টের অলিন্দে, জেরা করছেন, বিচারককে বোঝাচ্ছেন যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য।

আইনজীবী হিসেবে তিনি সব সময়ে সচেষ্ট থাকবেন যাতে বধূ নির্যাতনের মত বিষয়টি সুবিচার পায়। অনেক দুঃস্থ মহিলা যাঁদের আইনের সাহায্য নেবার আর্থিক অবস্থা নেই, তাদের জন্য কিছু করতে তিনি সব সময় আগ্রহী। তবে অনুশীলা নিজে মেয়ে হলেও স্বীকার করেন বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা ব্যাপারগুলোর জন্য শুধু মেয়েদের শ্বশুর বাড়িই দায়ী নয়, মেয়েদের নিজেদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। তাঁরা সব সময় বিবাহিত জীবনে নিজেদের এ্যাডজাস্ট করেন কি? বোধহয় না। একটু সহ্য করলে ভালবাসলে অনেক ঝামেলাই আদালত পর্যন্ত গড়াবে না।

কিন্তু এত কর্মচাঞ্চল্যের মাঝেও রবীন্দ্রনাথ থাকবেন ওঁর কাছে অম্লান হয়ে, রবীন্দ্র সংগীত হচ্ছে তাঁর কাছে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনে "লাইট হাউস"। যে আলো পথহারা নাবিকের সঠিক পথের দিশারী। রবীন্দ্রসংগীত অনুশীলার কাছে পরম পবিত্র গীতা উপনিষদের মত। আইনের কচকচানির মধ্যেও উনি বুঁদ হয়ে থাকতে চান রবীন্দ্রসংগীতের কলি নিয়ে যা তাঁর কাছে ভোরের শুকতারা সন্ধ্যার ধ্রুবতারা আর রাতের রজনীগন্ধার মত।□

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

কাছ থেকে দেখা দূরদর্শন

দূরদর্শনের 'খৈরী' ছবির নায়ক খৈরী টেপ রেকর্ডার শুনছে।

১৯৭৫-র ৯ আগস্ট কলকাতার বাতাস কে বুক ভরে অক্সিজেন নিল যে শিশুটি আজ তার বয়স দশ। অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে, সে পথ সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ নয়, নিন্দা প্রশস্তি রাগ অনুরাগের ছোঁয়া নিয়ে সেদিনের সেই শিশু কলকাতা দূরদর্শন আজও চলছে দুর্বার গতিতে, অনাবিল ছন্দে।

কলকাতা দূরদর্শনের দশ বছরের ইতিহাস, একটা বিশ্বাসের জন্মের ইতিহাস। প্রত্যয়দীপ্ত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলার, শপথের, কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চলার পথে স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে যাঁরা বাস্তবায়িত করছেন সেই কর্মযজ্ঞের কয়েকজনকে নিয়ে এ প্রতিবেদন।

কলকাতা দূরদর্শনের জন্মলগ্নে তার ক্যাম্প অফিস ছিল আকাশবাণীর একটি ছোট্ট ঘরে। এখন যে স্টুডিওতে এদের অফিস (আগেকার রাধা ফিল্ম স্টুডিও) সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিকৃত স্টুডিও। ভারতে একমাত্র রাজ্য সরকারের অনুদানে (প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা) প্রথম টি ভি স্টুডিও কলকাতার দূরদর্শন। একথা জানালেন তৎকালীন রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী।

এখন অবশ্য একটা স্টুডিও থেকেই কাজ কর্ম করা হয়। একসংগে চলে ৩টে ইলেকট্রনিক ক্যামেরা। ফিলিপস্ কোম্পনির তৈরি এই ক্যামেরা (PYE)-র সাহায্যে স্টুডিওতে অভিনীত দৃশ্য, গান, কথা, মিউজিক ইত্যাদি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে পরিণত করা হয়। এবং ঐ ট্রানসমিটার টাওয়ারের (গলফ্‌গ্রীন) মাধ্যমে সম্প্রচারিত করা হয়ে থাকে। এর জন্য স্পেশাল ভিডিও টেপ লাগে। অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের জন্য আছে দুটো ভিডিও রেকর্ডিং মেশিন। আউট ডোরের জন্য আর একটি। কলকাতার বাইরে যেমন দিল্লি, বোম্বের ইত্যাদি অনুষ্ঠান P & T-র micro wave link মারফৎ কলকাতা এসে পৌঁছেছে। আর দিল্লির signal relay হয়ে যাচ্ছে। আমরা মুহূর্তের মধ্যে ঘরে বসে কলকাতা, দিল্লি বা সাতসমুদ্রের ওপারের ঘটনা সংগে সংগে দেখছি। বিদেশের খবর বা দৃশ্য বহন করে নিয়ে আসছে দূর আকাশে থাকা স্যাটেলাইট।

কলকাতায় সাধারণত অনুষ্ঠানগুলো বিকেলের আগেই রেকর্ডিং হয়ে যায়। সংগে সংগে সম্পাদনার ব্যবস্থা আছে, যদি আরও সম্পাদনার প্রয়োজন থাকে রেকর্ডারের মধ্যেই সেই ব্যবস্থা আছে। রাতে আমরা সেই 'রেকর্ডেড' ঘটনাগুলো দেখি, অবশ্য এর মধ্যে 'live' programme যে থাকে না তা নয়। যেমন সংবাদ বা দিল্লির সংবাদ বা প্রয়োজনীয় অন্য অনুষ্ঠান যেমন খেলার মাঠ থেকে যেগুলো সরাসরি দেখানো হয়।

কলকাতা দূরদর্শনের স্পোর্টস বিভাগের কাজ একবাক্যে অনেকেই স্বীকার করবেন ভালো অনুষ্ঠান। স্পোর্টস বিভাগের প্রোডিউসার বিশ্বনাথ দাস কলকাতার দূরদর্শনের জন্মলগ্ন থেকেই এর সংগে জড়িত। পুনা থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। অবশ্য স্পোর্টসের আসার আগে উনি আরও চারটে অনুষ্ঠানের প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন। 'তরুণদের জন্য' 'কালচারাল রাউন্ড আপ', প্রেজেন্টেশন ইউনিট' ও কোলাজাপ 'কোলাজাপে' বরুনচন্দ্রকে দিয়ে সুপ্রিয়াদেবীকে উনি রেকর্ডিং করিয়েছিলেন রাত ১০ টা থেকে প্রায় ভোর রাত পর্যন্ত। সারারাত রেকর্ডিং-এর ঘটনা কলকাতা দূরদর্শনের ইতিহাসে এই প্রথম। এছাড়া চলচ্চিত্র মঞ্চ জগতের স্বনামধন্য শিল্পীদের ইন্টারভিউ করিয়েছেন চিত্র ও শিল্প জগতের ব্যক্তিত্বদের দিয়ে। ভারতের অন্যান্য দূরদর্শন কেন্দ্রে যত স্পোর্টস প্রোডিউসার আছেন তার মধ্যে O/B (Out door broadcasting) এর রেকর্ড সংখ্যা বিশ্বনাথবাবুর। আজ পর্যন্ত ২১৪টা অনুষ্ঠান করিয়েছেন, খেলার মাঠ থেকে। এর মধ্যে ৩টা ডেভিস কাপের খেলা। 'জুম ইন' অনুষ্ঠানে এসেছে ভরত বিখ্যাত খেলোয়ার, এ্যাথলীটরা। শুধু ভারতবিখ্যাত নয় বিশ্ববিখ্যাত এঁরা যেমন বাচেন্দ্রীপাল, তেনজিং নোড়গে, পতৌদি, পংকজ রায়, মাইকেল ফেরেরা প্রমুখ। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম থেকে তিনিই প্রথম 'লাইভ' টেলিকাস্ট করেন। সাধারণত দুটো ভ্যান নিয়ে যান প্রত্যেক ভ্যানে ৩টা করি ক্যামেরা থাকে। বিরাশির এশিয়াড উপলক্ষ্যে বিদেশি sports O/B বিশেষজ্ঞরা এদেশে আসার আগে বাস্কেটবল ভলিবল ব্যাডমিন্টন খেলার সরাসরি ছবি দেখানোর ঘটনার পথিকৃত কলকাতা দূরদর্শন। ১৬ জুলাই ১৯৮৫-র ইস্টবেংগল বনাম মোহনবাগানের খেলা প্রথম সরাসরি রঙীন টেলিক্যাসেটে হয়। হামবুর্গে নর্থ জার্মানি টেলিভিশনে স্পোর্টস প্রোডাকশন লেখেন '৮১ সালে। পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব স্পোর্টস আয়োজিত অন্যান্য কেন্দ্রের ক্রীড়া প্রযোজকদের ট্রেনিং দেবার দায়িত্ব ছিল বিশ্বনাথবাবুর উপর। ক্রিকেট টেস্ট খেলার আগে "Garden of Eden greets you" গানটির রচয়িতা বিশ্বনাথ বাবুই।

খেলার মাঠে কভার করতে গিয়ে মানসিক অবস্থা কেমন থাকে জিগ্যেস করতে বিশ্বনাথবাবু বললেন ভীষণ টেনস থাকি। ইউনিটের অন্যান্য কলিগ সাউন্ড এঞ্জিনিয়ার এডিটার প্রত্যেকের সংগে লিংক রেখে চলতে হয়। শুধু মাঠে নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেও তখন এক পারস্পরিক সহযোগিতার খেলা চলে। কেননা একবার একটা গোলদেওয়ার ছবি বা ক্রিকেটে আউট হবার ছবি মিস করি এটা তো আর রিহার্স করা যাবে না। জার্মান বিশেষজ্ঞের কথায় বলতে গেলে TB হচ্ছে "real drama, instant draam, life drama"

সাংবাদিকদের মত টিভির প্রযোজকদের টেনশন সব সময় চড়া পর্দা বাঁধা থাকে। একথা জানালেন কলকাতা দূরদর্শনের আরেক তরুন প্রযোজক, অভিজিৎ দাশগুপ্ত। অভিজিৎবাবু সাধারণতঃ ডকুমেন্টারী বিভাগটাই দেখা শোনা করেন। বললেন প্রথমত ছবি তৈরি করতে বলা হয়, আর দ্বিতীয়ত নিজের পছন্দমত করতে হয়। তবে নিজের পছন্দ মত করার ব্যাপারে মানসিক ইনভলমেন্টের ব্যাপারটা বেশি থাকে। একটা ডকুমেন্টারি ছবি করতে গিয়ে ডিটেলসের দিকে সব সময় নজর রাখতে হয়। অনেক সময় যান ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও অন্যান্য লাইব্রেরীতে। কখনো বিদেশ থেকে তথ্য আনান। জেমস অগাস্টস হিকির (১৯৬৬) তথ্যচিত্র করতে গিয়ে, ইন্ডিয়া লাইব্রেরি অব লন্ডন থেকে হিকির হাতে লেখা চিঠি (হেস্টিংসকে) প্রভৃতি আনতে হয়। কেননা হিকির সম্বন্ধে তেমন তথ্য বিশেষ জানা নেই। কিন্তু এই ছবিটা Best documentary Award of The Year পেয়েছে।

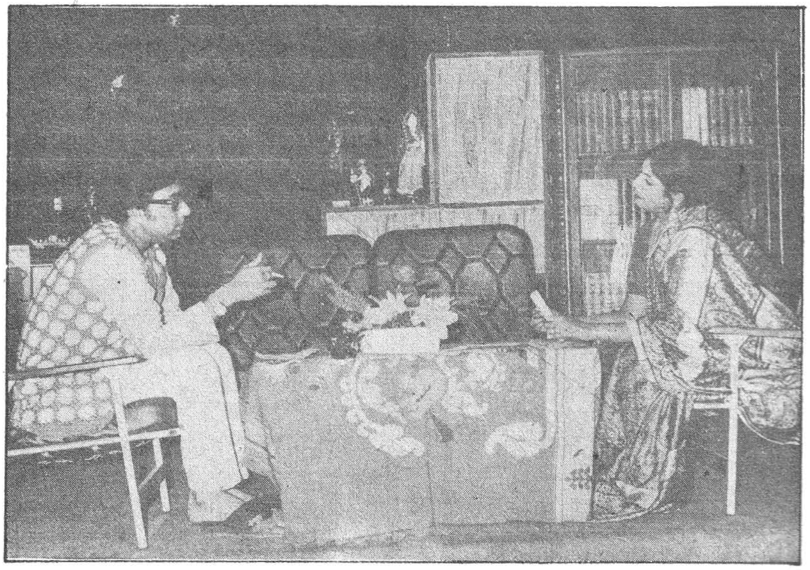

কলকাতার দূরদর্শনে 'ক্লোজ আপ' অনুষ্ঠানে দিলীপ রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

'মধুবনী' painting কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম রঙিন ছবি। বিহারের দূর গ্রামের ভেতরে রাত্রে শুটিং করতে গিয়ে অভিজিৎ বাবুর এক অভিজ্ঞতা হয়। একটা বিয়ের দৃশ্য ছিল। কিন্তু গ্রামের মাতব্বররা বলেছিলেন TV-তে যদি কোন মেয়ে বিয়ের দৃশ্যে অভিনয় করে সত্যিকারের তার আর বিয়ে হবে না! কনে ছাড়াই সেদিন বিয়ে হয়। আর এই দৃশ্য তুলতে হয়।

বোম্বে বা অন্যান্য রাজ্য থেকে কলকাতা কি ডকুমেন্টারী তৈরির ব্যাপারে পিছিয়ে আছে? না, কলকাতা দুবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে, বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। অভিজিৎবাবুর স্মরণীয় ঘটনাগুলোর মধ্যে, এশিয়ান গেমস ওপনিং সেরিমনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। কলকাতা থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিদেশের ৩৩টা দেশকে প্রত্যেক দিন ক্যাপসুল পাঠাতে হত তাঁকে। দিল্লিতে গতবছরে জুবিন মেহতার অনুষ্ঠানের প্রযোজক অভিজিৎ বাবু। এ বছর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিদেশ সফরের সঙ্গে উনি ছিলেন দূরদর্শনের পক্ষ থেকে প্রযোজক হিসেবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে কেমন লাগত, প্রশ্নকরতে অভিজিৎবাবু বললেন : ভীষণ টেনস থাকতাম। আমার চ্যালেঞ্জ ছিল, প্রত্যেক দিনের খবর প্রত্যেক দিনে পাঠাবো। আর খবরের কাগজের আগে। দিনে ৩বার স্যাটেলাইট ফিড করেছি, এর সঙ্গে 'লাইভ' অনুষ্ঠান তো ছিলই। প্রধানমন্ত্রীকে কাছ থেকে কেমন লেগেছে? সব সময় হাসি খুসী, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতেন, দলের সংগীদের খবর-টবর রাখতেন সব সময়। আর বিদেশীদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

পুনায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত অভিজিৎবাবু ১৯৭৪ দূরদর্শনে আসেন। ওড়িশার বিখ্যাত বাঘ "খৈরী", আসামের 'বিহু' ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ছবি করেছেন। দেশেও বিদেশে (যুগোশ্লাভিয়া) অনেক পুরস্কার পেয়েছে তাঁর ছবি। "আমরা সব সময় সময়ের সংগে যুদ্ধ করছে, how best, what best you can do in time হচ্ছে আমাদের 'মটো'।

আরেক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের প্রযোজক অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে দেখা হল। উনি ক্লোজাপ, ঐকতান ও টেলিস্কোপের প্রযোজক। ক্লোজাপ বছরে ৪টা করে, টেলিস্কোপ মাসে ২টো করে ঐক্যতান মাসে ১টা করে অনুষ্ঠান হয়। ক্লোজাপে করিয়েছেন রবীন মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুন্ধতী দেবী প্রমুখ। এখন ব্যস্ত আছেন মঞ্জু দে-কে নিয়ে। পল লিনগ্রেন ও ডঃ জেমস হ্যচরকে নিয়ে অনুষ্ঠান তাঁর ক্লোজাপর স্মরণীয় সংযোজন। টেলিস্কোপের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬.৩০ এ দেখিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর জাতীয় অনুষ্ঠানে সমস্ত ভারত থেকে সম্প্রসারিত হয়। এশিয়াডে সাঁতার ডাইভিং ওয়াটার পোলো কভার করেছেন। কাছ থেকে দেখেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া উল হক আর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদকে তাঁরই কবিতার বই 'কনক প্রদীপ জ্বালো' আবৃতি করে পুরস্কার পেয়েছেন—তাঁরই নিজের নামলেখা ব্যাচে এরশাদের লেখা, 'বোন অনন্যাকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানাই।' স্মরণীয় ঘটনা বলতে গিয়ে বললেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান কভার করতে গিয়ে "সান গান" সশব্দে ফেটে যায়, সেই সময় সিকিউরিটির লোকরা বন্দুক নিয়ে তাঁদের ঘিরে ফেলেন, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন তিনি গুলিবিদ্ধ, চেঁচিয়ে উঠেছেন 'I am shot' পরে ভুল ধরা পড়ে। কি লজ্জার ব্যাপার।

কার্শিয়ঙের মেয়ে মাকাইবাড়ী চায়ের অন্যতম অংশীদার অনন্যাকে জিজ্ঞেস করি দর্শক হিসেবে দূরদর্শনের কোন অনুষ্ঠান ভালো লাগে না। "চিত্রমলা" "যদিও কলকাতার শতকরা ৯৯ জন আমাকে সমালোচনা করবে, কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত মত।" অনন্যা রামকৃষ্ণ মিশনে স্পোকেন ইংরাজি পড়ান আর এই কাজে তিনি পান শান্তি ও "Job satisfaction।"

কলকাতা দূরদর্শনের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রযোজক ডঃ অলোক সেন এত বেশি পরিবেশ সচেতন যে তাঁকে বন্ধু বান্ধবরা ঠাট্টা করে বলেন "পরিবেশী এল" বা "environment এলেন"। তিনি কি ভাবে কাজ করছেন জানতে চাইলে। তিনি বললেন, কলকাতা পুরসভা, সি এম ডি এ, সি আই টি, সি এম ডবলিউ এস এ, এদের কাছে আমাদের যে Service পাবার অধিকার আছে, সে চেতনা জাগাতে পেরেছি। জনসাধারণকে বোঝাতে পেরেছি যে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন মহতী কাজ হয় না। পশ্চিমবংগ সরকারের বনবিভাগের সহযোগিতায় প্রচুর গাছ লাগিয়েছি, আর আমাদের গলফ গ্রীনের নতুন Complex-এর ১৫০ রকমের গাছ লাগানো হয়েছে। স্টুডিওর ইউক্যালিপটাস দেবদারু ও আরও অনেক গাছ দেখিয়ে ডঃ সেন বলেন যে আমি একটা mini botaniocal garden করতে চাই। প্রত্যেক গাছের গায়ে গাছের বংশতালিকা লাগানো থাকবে। বাচ্চারা এলে জানতে পারবে। পার্থেনিয়াম গাছ লোককে চেনানোর জন্য তাঁর বিভাগ অনেক কাজ করেছে।

মায়েদের বুকের দুধ যে সন্তানের পক্ষে

অত্যন্ত প্রয়োজন একথা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করে আধুনিকা মায়েদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছেন।

অনেক দেশ ঘোরা ডঃ সেনকে এদেশ ও বিদেশের দূরদর্শনে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা নিয়ে জিগ্যেস করতে চাইলে তিনি বলেন, এদেশে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দৃষ্টিভংগীর ত্রুটি আছে, যখন নিজেদের প্রকাশ করার বাসনা জাগে তখন দূরদর্শনে আসেন। অনেক বিজ্ঞানীর টিভি দেখার সময় নেই। অন্য বিজ্ঞানীদের অনুষ্ঠান দেখার অনীহা, কিন্তু সিনেমা দেখেন, আরও ভালো লাগে নিজে অনুষ্ঠান করলে। যাঁরা অনুষ্ঠান করেন না তাঁদের বক্তব্য টিভিতে নামলে খেলো হয়ে যেতে হয়। এদেশে একজন টিভি বা রেডিওর ব্রডকাস্টার শিক্ষার জগতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি পান না। তাঁরা একজনের অধ্যাপকের অধীনে ক'জন পি এইচ ডি, ডি এস সি করল এইভাবে মূল্যদেন, প্রমোশন পান। কিন্তু বিদেশে (নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন) ব্রডকাস্টাররা তাঁদের bio-dataতে লেখেন আমি এত অনুষ্ঠান ব্রডকাস্ট করেছি আর তার জন্য তাঁরা স্বীকৃতি পান।

"Quest"-এর প্রযোজক ডঃ অলোক সেনের "experiment based science quiz" এদেশে একমাত্র এবং প্রথম অনুষ্ঠান। কিন্তু তাঁর অনুযোগ DST, CSIR কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত বিজ্ঞান চেতনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই গড়ে ওঠে না, দেশের শিক্ষার ব্যাপারে mass media (TV) পটভূমিকা আছে। তাই ব্রডকাস্টার ও টেলিক্যাস্টারদের উৎসাহিত করলে বিজ্ঞানীরা আরও বেশি নেমে আসতেন যাতে mass media-র মাধ্যমে "idea ও imagination" ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তাঁর 'Quest' programme দেখে ডঃ মিসেস বিজয়া মূলে UGC-র দুপুরের programme-এ "Quest" কে পুনঃ সম্প্রচারিত করতে চেয়েছেন।

"Quest" রাত ৯.২০ তে মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে টেলিকাস্ট হয় জাতীয় অনুষ্ঠানে। আর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোজ ১ হাজার থেকে বারোশ'র মত চিঠি আসে। শুধু তাই নয় পশ্চিম পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকেও হয় পত্রাঘাত। ডাঃ সেনের টেবিলে দেখলাম সত্যিই চিঠির পাহাড়। সেদিনেরই ডাক।

সমালোচকদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ সেন জানালেন আমি গঠনমূলক সমালোচনা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু অতি সম্প্রতি একটি ইংরাজি দৈনিকে তাঁর অনুষ্ঠানকে "ridiculously elementary" লেখায় তিনি ক্ষুব্ধ। তাঁর বক্তব্য সমালোচক যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে প্রশংসা করেছেন কিন্তু তবু তিনি বলতে বাধ্য ইংরাজিতে দখল থাকলেও সমালোচকের মাধ্যমটি সম্পর্কে জ্ঞান খুব বেশি নয়। আমি Ph. D. D. Sc তৈরি করতে চাই না। বিজ্ঞান সচেতনতা তৈরি করা আমার কর্তব্য। আর আমার বিচারক আমার দর্শকরা। যদি আমি ১০ বছরের মধ্যে একটা লোককেও বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে পেরেছি, আমি নিজেকে সার্থক মনে করব।

দূরদর্শনের অধিকর্তা নির্মল শিকদার ১. ৯. ৮২ তে দায়িত্ব নিয়েছেন কলকাতা দূরদর্শনের। কথা প্রসংগে জানালেন, কলকাতা দূরদর্শন ১০ কিলো ওয়াটের মধ্যেই তার ট্রানসমিশান সীমাবদ্ধ। এটা আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড। কলকাতা দূরদর্শন রঙিন অনুষ্ঠান ৬. ৬. ৮৩ থেকে তৈরি করা শুরু করেন। এরা খবর পান এজেন্সির ও যেখানে নিজস্ব সংবাদদাতা নেই সেখানে আকাশবাণী খবর দেয়।

এশিয়া ভিসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াকে তাঁরা 'ফিড' পাঠান ও বিনিময়ে 'ফিড' পান। আর 'ইউরোভিসন' দিল্লি কো-অর্ডিনেট করে। সত্যিকারের টিভি নিউজ পেতে গেলে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম দেখা উচিত। ভবিষ্যতে সংবাদের জন্য কি সময় বাড়াবেন? "সত্যিই কি দিনে আর সংবাদ পরিবেশন বাড়ানো উচিত? আমার তো মনে, হয় যা আছে তা যথেষ্ট। সব কিছু করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য সব করা তো সম্ভব নয়।" উনি জানালেন: 'খবর সাধারণত কালারে তোলা হয় (ওঁদের ছটা ইলেকট্রনিক ক্যামেরা আছে) আর কিছু stringer আছেন যাঁরা নিজেদের 16 mm ক্যামেরা সাদা কালোতে ছবি দেন। যেমন কলকাতার কোন জায়গায় জল জমেছে সেখানে যদি একটা ভিডিও ক্যামেরা কোন রকমে নষ্ট হয় তাহলে ১৪-১৫ লাখ টাকার ক্ষতি। আপনারা অন্য অনুষ্ঠানের মত সংবাদ কি sponsor করবেন?' না এটা করতে চাই না। তবে news-এর আগে অন্য বিজ্ঞাপন থাকতে পারে।

আপনাদের নতুন বাড়ির অবস্থা কতদূর: বিরাট বাড়ি হচ্ছে sophisticated studio হচ্ছে: civil-এর কাজ শেষ। খুব তাড়াতাড়ি হয়ত চলে যাব। বাড়িটা সুন্দরভাবে সাজাচ্ছি, গাছ দিয়ে, এটা কলকাতার অন্যতম টুরিস্ট স্পট করতে চাই।

আপনি আসার পর এখানে colour হয়েছে এর জন্য আপনার কৃতিত্ব কতটুকু? "আমি খুশি। তবে এটা হতই। আমি না থাকলে অন্য কেউ থাকতেন। আমি থাকাটা একটা নিমিত্ত মাত্র।"

কলকাতা দূরদর্শনের কিছু অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমালোচনা করতে নির্মলবাবু বললেন আমাদের "constant endavouris to make more perfect" আমাদের নিজেদের ভুলত্রুটি নিয়ে একটা হাসির ছবি হয়েছিল 'TV-VT'।

কথা বলতে বলতে নির্মলবাবু খবরের কাগজের দূরদর্শন বিষয়ক সমালোচনা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন। তলায় দাগ দিয়ে আমার সামনেই এক প্রযোজককে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ফুটবলখেলার একটা কাগজের মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এবং তা note করলেন।

সমস্ত দিন শেষ। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। কুড়ি পঁচিশজন প্রযোজকের মধ্যে সবাইকে পেলাম না। পেলাম না সেই অতি পরিচিত শাশ্বতী, চৈতালী, কমলিকা, ইন্দ্রাণী, জয়া, ছন্দা, রীতা, শর্বরী, অরুন্ধতী, দেবযানী, মধুমন্তীদের। যাঁদের অপরূপ মুখশ্রী আর সুরেলা গলা লক্ষ হৃদয়ে দোলা দেয়। একজনকে পেলাম ডিউটি রুমে, সুদর্শনা, স্নিগ্ধা বরাট। একটু পরেই 'নিরুদ্দেশ' ঘোষণা করবেন তৈরী হচ্ছেন। বাড়িতে তাঁর বাচ্চার জ্বর তবুও মুখে হাসি। হাসি ওঁদের মূলধন। সব দর্শককে খুশি রাখতে চান। তাজা, তরুণ প্রাণবন্ত কাজ পাগল লোকগুলোকে দেখলে অন্তত এটুকু নিশ্চিত ভারত সরকারের কলকাতা দূরদর্শন সত্যি কাজ করছে অক্লান্তভাবে, নিষ্ঠারসংগে, সবাই এক জোট হয়ে, এক মন্ত্র নিয়ে, সে মন্ত্র সামনে এগিয়ে চলার। □

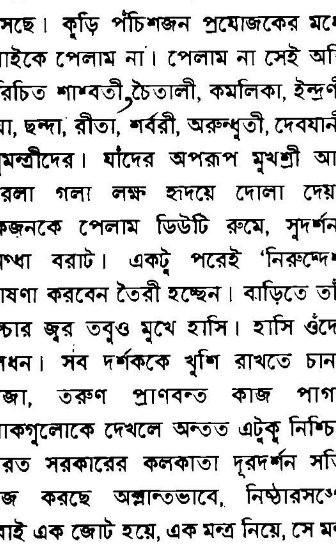

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইলেকট্রনিক টেস্ট ল্যাবরেটরী

কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা ইলেকট্রনিক্স্ রিজিওনাল টেস্ট ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর গ্রুপ ক্যাপটেন মানস মুকুটমণি জানালেন, কলকাতায় এমন কতকগুলি টিভি সেট বাজারে চলছে যা আমাদের ল্যাবরেটরিতে অমনোনীত বিবেচিত হয়েছে। ই আর টি এল এর সার্টিফিকেট ছাড়াই তাঁরা মাল বাজারে ছাড়ছেন এটা বেআইনী। যে কোন টিভি প্রস্তুতকারকদের তার 'ব্রান্ড' স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন করার জন্য বছরে অন্তত দুটি করে সেট এখানে পাঠাতে হয়। ই আর টি এল টি ভি-র মান নির্ণয় করার পর একটি সার্টিফিকেট দেয়। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রকের অনুমোদিত আই এস আই সংস্থার মতন একমাত্র ই আর টি এল ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের স্ট্যান্ডার্ডাইজেসনের অধিকর্তা। ইচ্ছে করলে তাঁরা বাজারে যে কোনও প্রস্তুত টিভির মান যাচাই করতে পারেন এবং প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল করে দিতে পারেন। কলকাতায় তারাতলা ওয়েবেল কমপ্লেকসে তাদের অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে এ পর্যন্ত মোট ২৯টা টি ভি কোম্পানি তাঁদের সেট চেক আপ করিয়েছেন, যার মধ্যে ১৬টি অনুমোদিত সার্টিফিকেট পেয়েছে। বাকী ১৩টি অনুমোদন পায়নি। অথচ এরা বিশেষ বিজ্ঞাপনের জোরে তাদের রঙীন টিভি বাজারে বিক্রি করছেন। তিনি জানান এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মন্ত্রক এদের আমদানী লাইসেন্স বাতিল করতে পারেন।

গ্রুপ ক্যাপটেন মুকুটমণি জানালেন, টিভির ক্রেতারা ঠিক মতন জানেন না যে কলকাতায় এই ধরনের একটি সংস্থা রয়েছে। যাঁরা সরাসরি টিভি ব্যবহারকারীদের সেট প্রয়োজনে পরীক্ষা করে দেন এবং সেটে যদি কোনও প্রস্তুতকারকের ত্রুটি থাকে তাহলে সেই টিভি প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন।

যে কোনও টিভির মালিক যদি মনে করেন তাঁর টিভি সেটে গোলমাল আছে তাহলে সরাসরি তারাতলা ই আর টি এল-এ আনতে পারেন। এক্ষেত্রে ২০০ টাকা ফি দিয়ে মাত্র সাতদিনের মধ্যে জানতে পারবেন তাঁর টিভিতে কি ত্রুটি তার টিভিটি সারিয়ে দেবেন।

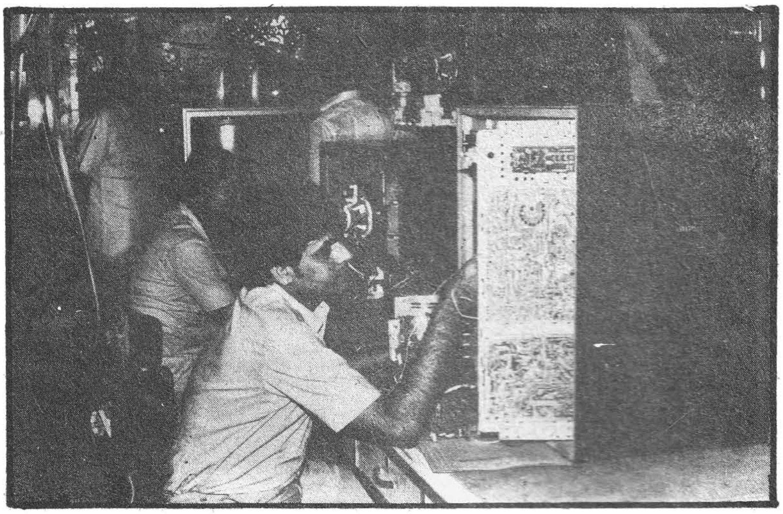

একটি টেলিভিশন সার্ভিস সেন্টার

নজর রাখুন

আপনার টিভি যন্ত্রটি বেশি দিন ভালো ভাবে রাখার জন্য –

(১) ভোল্টেজ যাতে ঠিক থাকে সে দিকে নজর রাখুন

(২) ঘরে যাতে হাওয়া খেলে সেদিকে দেখুন

(৩) ঘরে যাতে ধুলোবালি বেশি না আসে সেদিকে নজর রাখুন

(৪) টি ভি চলাকালীন লোডশেডিং হলে টিভির সুইচ অফ করে দিন

(৫) অ্যান্টেনা যাতে বেশি নড়া-চড়া না হয় সেদিকে দেখুন

(৬) আপনার সেটের ভেতর যাতে পোকামাকড় না ঢোকে বিশেষ করে আরশোলা সেদিকে সতর্ক থাকুন, দরকার হলে ন্যাপথলিন রাখুন

(৭) প্রয়োজনে সেট খারাপ হয়ে গেলে মেকানিক ডাকুন, জানা না থাকলে নিজে সেট খুলবেন না।

(৮) চলাকালীন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে আপনার সেটের সুইচ সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাবেন না।

যদি টিভি প্রস্তুতকারকের ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে তিনি জানালেন।

শ্রী মুকুটমণি জানালেন, ই আর টি এল প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ইলেকট্রনিক্স জিনিসের মান নির্ণয় করা। তার জন্য বহু বিদেশী সরঞ্জাম এখানে আনা হয়েছে। যাতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ত্রুটি ধরা পড়ে এবং টিভির নির্দিষ্ট মান বজায় আছে কিনা দেখা যায়।

তিনি জানালেন টিভি প্রস্তুতকারকদেরও উচিত তাদের টিভি স্টান্ডার্ডাইজ হয়েছে কিনা তা এখানে পরীক্ষা করে নেওয়া। মাত্র ৭৫০ টাকা জমা দিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা সেট পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিতে পারেন। এই ল্যাবরেটরীতে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে টিভি, টু ইন ওয়ান, স্টিরিও, ভিডিও, রেডিও ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন ক্যালিব্রেসন, ওসিলোমস্কোপ, রেজিস্টার কাপাসিটার, ট্রান্সফরমার টেলিভিশন কমপোনেন্ট, আই সি টেস্টিং ডিজিটাল, এনালগ, অটোমেটিক টেস্ট, স্টেবিলাইজার, ইনভারটার, এমপ্লিফায়ার ট্রান্স রিসিভার প্রভৃতি টেস্ট করানো যায়। এছাড়া ভাইব্রেশন টেস্টও ওখানে হয়।

তারাতলা ল্যাবরেটরীটি একদম হাসপাতালের অপারেশন রুমের পরিবেশ। যাতে কোনও ধুলোময়লা ঢুকতে না পারে তার জন্য সম্পূর্ণ এয়ারকন্ডিশন। এখানে একটি টিভি সেট সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় টেস্ট করা যায়। এমনকি যেকোনও ভাইব্রেশনে টিভি সেট কার্যকারী কিনা তাও পরীক্ষা করা যায়।

ফোর্ট উইলিয়ামে ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দূরদর্শনের ডকুমেন্টারীর পরিচালক অভিজিৎ দাসগুপ্ত ও অন্যান্য।

প্রায় এক কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৮১ সালে ১৫ই জুন রিজিওনাল টেস্ট ল্যাবরেটরীটি উদ্বোধন হয়। উদ্দেশ্য পূর্বাঞ্চলে ইলেকট্রনিকসের যে সব বস্তু তৈরী হবে তার মান ঠিক আছে কিনা তা দেখে দেওয়া। শুধু তাই নয় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র প্রয়োগের প্রশিক্ষণও এখানে দেওয়া হয়। গ্রুপ ক্যাপটেন জানালেন, যেদিন এটি তৈরী হয়েছিল সেদিন এর এতটা গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু আজ যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ইলেকট্রনিক যুগের সূচনা করলেন, তখন এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খুব বেড়ে গেছে।

ই আর টি এল ২৩ লাখ টাকা দিয়ে সল্ট লেকে জমি কিনেছেন, যাতে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রয়োগশালাটি কাজ করতে পারে। এর জন্য ৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন। ১৯৮৭ সাল নাগাদ এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে য্যাবে বলে মুকুটমণির আশা।

তিনি জানালেন কেন্দ্রীয় সরকার ইলেকট্রনিক টেস্ট ল্যাবরেটরীটি আই এম আই প্রতিষ্ঠানের মতন গুরুত্ব দিতে চান। এর জন্য খুব শীঘ্র একটি ইলেকট্রনিক আইন প্রণয়ন করা হবে। এতে সংস্থার গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে।

কিন্তু টিভি প্রস্তুতকারক যে গবেষণা করছেন বলে দাবী জানিয়েছেন তা খন্ডন করে গ্রুপ ক্যাপটেন মুকুটমণি জানালেন, কলকাতা বা পূর্বাঞ্চলে এমন একটিও টিভি প্রস্তুতকারক নেই যাদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ আছে। অবশ্য কিছু কিছু সংস্থা তাদের কাছে ইঞ্জিনীয়ারদের পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা সেমিনারে যোগ দিচ্ছেন। তাঁর মতে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে সাধারণ কোম্পানীর পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

গ্রুপ ক্যাপটেন মানস মুকুটমনি

তারাতলায় গবেষণা কেন্দ্রটি ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে এত নিখুঁত ব্যবস্থা যিনি পরিচালনা করছেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে উপায় নেই। বলতে গেলে কেন্দ্রের সংগে লড়াই করে মানসবাবু আজ এখানে দু কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বসাতে সক্ষম হয়েছেন।

আশার কথা গ্রুপ ক্যাপটেন মুকুটমণি আর বিমানবাহিনীতে ফিরে যাচ্ছেন না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক দপ্তর তাঁকে জয়েন্ট সেক্রেটারী পদে উন্নীত করে পুনরায় ই আর টি এলের ডিরেক্টর পদে বহাল রেখেছেন। ফলে স্বস্তি পেয়েছেন ল্যাবরেটরীর অন্য কর্মীরা। কারণ এমন নেতা না হলে এতবড় সংস্থা গড়ে উঠতো না।

এক প্রশ্নের উত্তরে মানসবাবু জানালেন, পূর্বাঞ্চলে যে সব টি ভি তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির মান খুবই উন্নত। তবে রঙীন টিভির ক্ষেত্রে মান আরও উন্নত হচ্ছে।

তিনি অবশ্য টিভি সেটের বদলে দূরদর্শনের ট্রান্সমিশনের ত্রুটিটাই বড় করে দেখালেন। ট্রান্সমিশন সেন্টারের গলদেই সেটে ভাল ছবি দেখা যায় না। খুব দ্রুত টিভি সেন্টার স্থাপন করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে যেগুলো সংশোধন করলে টিভির পর্দায় ছবি আরও ভাল আসবে। রং ভাল আসবে। তাই টি ভি হেজি হলে দোষ সেটের উপর পড়লেও আসলে দোষ টি ভি সেন্টারের।

টিভির মান সম্পর্কিত সার্টিফিকেট নেবার সময় ই আর টি এল কর্মীদের ইনফ্লুয়েন্স করা যায় কিনা প্রশ্ন করা হলে মানসবাবু জানালেন, এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত সতর্ক। কোনও টিভি সেট টেস্টে আসলে আমরা প্রথমেই ব্রান্ডনেমের লেবেলটি তুলে দিই এবং একটি কোড নম্বর দিয়ে বিভিন্ন ইউনিটে পাঠাই। ফলে কোনটি কার মাল তা ধরা মুশকিল। তাছাড়া কোনও টিভি প্রস্তুতকারকের লোকেদের মূল ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তিনি রিসিভিং সেন্টারে নিয়ে গিয়ে দেখালেন কিভাবে কত গোপনে জব কার্ড তৈরী করা হয়। □

টিভির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফারাক থাকবেই

দেশে প্রায় ৪৫০টি টিভি প্রস্তুতকারক সংস্থা যে হারে টিভি তৈরি করছেন তাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টিভির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। একথাটা মনে রেখেই সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকার ইলেকট্রনিক উপকরণ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছেন। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ১৯৮৬-৮৭ সালে দেশে টিভির চাহিদা হবে চার কোটি।

এটা সুখবর, কিছু কোম্পানী সুলভে সাধারণ লোকের জন্য টিভি তৈরিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিদেশে টিভির মূল্য এখানকার থেকে অনেক কম। এর কারণ বেশী উৎপাদন। এখানেও ধীরে ধীরে টিভির দাম কমানোর একটা ঝোঁক কিছু কোম্পানীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

কিছু নামী কোম্পানী যদি বাইরে থেকে মাল তৈরি করে শুধু ব্রান্ড নেম লাগিয়ে বিক্রি করেন তাহলে লোকের মনে ভাল জিনিসের প্রতি আস্থা চলে যাবে।

সম্প্রতি একটি পত্রিকায় ফিলিপস সম্পর্কে এই ধরনের তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় ফিলিপস সম্পর্কে আস্থা ব্যাহত হয়েছে। যদিও ফিলিপস নিজের মাল সম্পর্কে খুবই সজাগ। তারা বাইরে থেকে মাল তৈরি করালেও তার গুণাগুণ যাচাই না করে বাজার ছাড়ে না।

রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র শিল্পে ইলেকট্রনিক্সকে উৎসাহ দেবার জন্য তিন বছরের বিক্রয় কর ছাড় দিয়েছেন। এতে বেশ কিছু কোম্পানী প্রলুব্ধ হয়ে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছেন। এই কোম্পানী বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ এনে শুধু জোড়া লাগিয়ে টিভি তৈরি করছেন এই সব সেটে মন্দ কাজ করছে না। বিশেষ করে সাদা কালো টিভিতে দোষ ত্রুটির অভিযোগ নেই বললেই চলে।

কিন্তু এখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে মাল আমদানীতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দেশে টিভির যন্ত্রাংশ আমদানী করা হয়। ইদানীং চীনে টিভির চাহিদা এত বেড়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে কিট পাওয়া বেশ

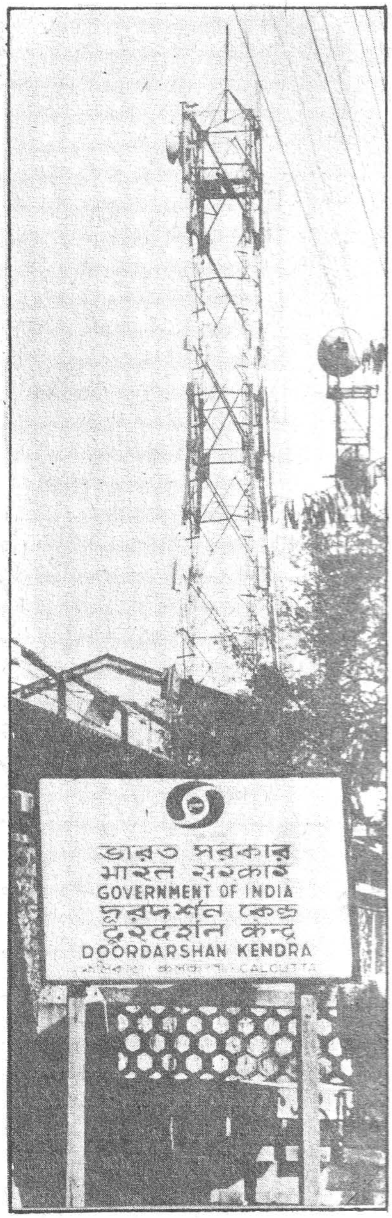

টালিগঞ্জে বর্তমান দূরদর্শন স্টুডিও

মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্য সরকার 'ব্রান্ডনেমের' উপর শুল্ক ধার্য করার পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বড় কোম্পানীগুলির চাপের সামনে বাজারে যাতে ছোট কোম্পানীগুলি বেঁচে থাকতে পারে সেটা দেখার জন্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু দেখা দরকার কেউ যেন শুল্ক মুকুবের সুযোগে মাত্র কিছুদিনের জন্য এখানে কারবার না করে।

বিদেশী কোম্পানীগুলি যদি কলকাতায় উৎপাদন করতে চায় তাহলে তাকে স্বাগত জানানো উচিত। এতে আধুনিক কারিগরীগুলি এদেশে পৌছতে পারবে।

রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তরের ডেপুটী ডিরেক্টর রীণা দাসের (যিনি ইলেকট্রনিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্তা) মতে 'ব্রান্ডনেমে'র উপর শুল্ক মুকুব করা ঠিক নয়। এতে বড় কোম্পানীগুলি ছোট কোম্পানীর বাজারে প্রতিযোগিতায় নামবে। বড় কোম্পানী যে হারে বিজ্ঞাপন করতে পারবে তা ছোট কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য অল ইন্ডিয়া রেডিও এন্ড ইলেকট্রনিক্স এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি এস পি কাপুর চান ব্রান্ডনেম শুল্ক মুকুব। তাঁর যুক্তি যত শিল্প কলকাতায় আসবে ততই ইলেকট্রনিক শিল্পে প্রসার হবে। এবং এখানে টিভি তৈরি হলে তার দাম কম হবে। গ্রাহকদের সুবিধা হবে। তাছাড়া ঘরে ঘরে সহযোগী ছোট শিল্প গড়ে উঠবে।

বিষয়টি এখন মুখ্যমন্ত্রীর দপতরে। সম্ভবত আগামী মাসে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে পারে।

কিছু কিছু টি ভি প্রস্তুতকারকরা চেয়েছেন রঙীন টিভির ক্ষেত্রে তিন বছরের জায়গায় ছয় বছরের শুল্ক রেহাই। তাদের বক্তব্য রঙীন টিভির বিনিয়োগে অনেক বেশী খরচ। তাই অল্প সময়ে কেউ ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের আমদানী নীতি সহজ হওয়ায় ইদানীং টিভি কোম্পানীগুলি বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ এনে টিভি তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছেন। আজকাল টিভির বাজারে তিনটি গুণ থাকলেই বাজার মাত করা যায়। এক বড় কোম্পানীর ব্রান্ডনেম, দুই কোনও বিদেশী সংস্থার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করা, তৃতীয় বিজ্ঞাপনের জন্য বড় বাজেট।

পোর্টেবল টিভির ক্ষেত্রে এই সমস্যা কম। ওটি বহনযোগ্য। যদি খারাপ হয় গ্রাহক সরাসরি সার্ভিস স্টেশনে এসে সারিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

আর ব্যাঙের ছাতার মতন টিভি এখন ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে। বাজারে তা ভাল বিক্রীও হচ্ছে। অথচ টিভির গুণাগুণ বজায় রাখা সম্পর্কে সরকার কোনও আইন এখনও স্থির করেননি। আই এস আই যেমন জিনিসের সঠিক গুণাগুণ ঠিক আছে কিনা দেখে সার্টিফিকেট দেন, তেমনি ই আর টি এল সংস্থাকে মান নির্ণয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। প্রয়োজনে তারা হাতে লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল করতে পারেন।

বর্তমানে আইন থাকলেও তা ঠিক মতন কার্যকর হচ্ছে না। তাই বহু টিভি সংস্থা

ল্যাবরেটরীতে যথার্থ গুণাবলী পরীক্ষা না করেই বাজারে ছাড়ছেন। এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার।

তেমনি টিভির দোষ ত্রুটির জন্য শুধু টিভি প্রস্তুতকারককে দোষী সাব্যস্ত না করে টিভি ট্রান্সমিশন স্টেশনের গলদগুলি শোধরানো উচিত। ইলেকট্রনিক রিজিওনাল টেস্ট লেবরেটরীর ডিরেকটর গ্রুপ ক্যাপটেন মানস মুকুটমণি স্বীকার করেছেন যে টিভির ছবি স্পষ্ট না হওয়ার মূল কারণ ট্রানসমিশনের গলদ। দেশের সবকটি ট্রান্সমিশন দ্রুত কমাতে গিয়ে এইসব গলদ রয়ে গেছে। তাই টিভির ছবি স্পষ্ট নয় বা রঙও ঠিক নয়।

পরিশেষে টি ভি থেকে চোখের ক্ষতির ব্যাপারে এখন থেকে সজাগ হওয়া উচিত। যেকোনও রঙ চোখের পক্ষে ভাল নয়। বিশেষ করে যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টি ভি দেখেন তাঁদের চোখ যাতে খারাপ না হয়, কোন স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি না করে তার জন্য মিষ্টি ও হালকা রঙের ছবি আসা প্রয়োজন। সবুজ রঙ চোখের পক্ষে কম ক্ষতিকারক।

কিছু টিভি প্রস্তুকারক সংস্থা রঙীন টিভির রঙ জমকালো করার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন, যাতে টিভি বিক্রি বেশী হয়। কিন্তু পরিবেশ দূষণের মতন চোখ দূষণ বন্ধ করার কথা এখনই ভাবা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন দূরদর্শনকে গ্রামীণ শিক্ষা প্রসারের একটা মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেছেন তখন গ্রামের লোকের কাছে যাতে সস্তায় টিভি পৌঁছতে পারে তার জন্য ভাবা উচিত। সরকারের উচিত ১২ ও ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির উপর থেকে যে ১০০ টাকা অন্ত শুল্ক নেওয়া হয় তা তুলে নেওয়া, এতে দাম আরো কমে যাবে। সরকার ও টিভি প্রস্তুতকারকরা চেষ্টা করলে এক হাজার টাকার মধ্যে একটি পোর্টেবল টিভি দেওয়া অসম্ভব নয়। তখন গ্রামের বর্ধিষ্ণু চাষী ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা একটা টিভি কেনার কথা ভাবতে পারবেন।

ভিপ্টেন টিভি তাঁদের সেটের জন্য একবছরের ইন্সিওরেন্স স্কীম প্রথা চালু করেছেন। ওরিয়েন্টাল ইন্সুরেন্স এক ঝুঁকি বীমা চালু করেছেন, যাতে টিভি যদি চুরি হয়ে যায় বা পুড়ে যায় তাহলে ইন্সুরেন্স কোম্পানী তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। টিভি কেনার প্রথম বছর এই বীমার টাকা ভিপ্টেন নিজেই দেবেন। এই ধরনের বীমা প্রথা টিভিতে এই প্রথম। □

অমলেন্দু কুণ্ডু

দূরদর্শন থেকে দূরে থাকুন

গত ২২ আগষ্ট 'যুগান্তর' পত্রিকায় টি ভি সম্পর্কে প্রকাশিত একটা চিঠির দিকে চোখ রাখি। চিঠিটি লিখেছেন ঈশ্বরপুর মেদিনীপুর থেকে বিনোদবিহারী মন্ডল নামে এক ভদ্রলোক। 'টি ভি কিনে এখন ঘরে টেকাই দায়' -- এই শিরোনামের চিঠিটি ছিল এইরকম --

"ছেলেমেয়েরা বায়না ধরেছে আর গিন্নীর তো অভিযোগের অন্ত নেই, পড়শী টি ভি কিনেছে অতএব আমাকেও কিনতে হবে তা না হলে নাকি মান-মর্যাদা থাকে না। আমার সাধ্য নেই টি ভি কেনার, কিন্তু যেহেতু সংসারের শান্তি বজায় রাখতে হবে ও নিজেকে শান্তিতে থাকতে হবে সেহেতু ধার-দেনা করে অনেক কষ্টে একটা টি ভি কিনে ফেললাম। সেদিন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের যতটা খুশি হতে দেখেছিলাম, তেমন খুশি বোধহয় তাদের কোনদিন হতে দেখিনি।

টি ভি তো কিনলাম। কিন্তু কিনে কি শান্তি আছে? টি ভি'কে এখন মনে হচ্ছে একটা মস্ত আপদ। শুধু সকালবেলাটা বাদ থাকে। দুপুরে বিকালে ও রাত্রে স্ত্রী টি ভি খুলে বসেন। রাত্রে জোরজার করে ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসালেও তাদের উড়ু উড়ু ও কচিকাঁচা মন টি ভি'র দিকে স্বাভাবিকভাবেই পড়ে থাকে। স্কুল থেকে এসেই সকলে টি ভি'র সামনে বসে পড়ে। ছেলের খেলাধূলা ও মেয়ের গান শেখা শিকেয় উঠেছে। সন্ধ্যায় অফিস থেকে এলেই স্ত্রী হাসি-হাসি মুখ করে বলবেন, 'জানো আজ খুব ভাল প্রোগ্রাম আছে, চমৎকার নাটক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

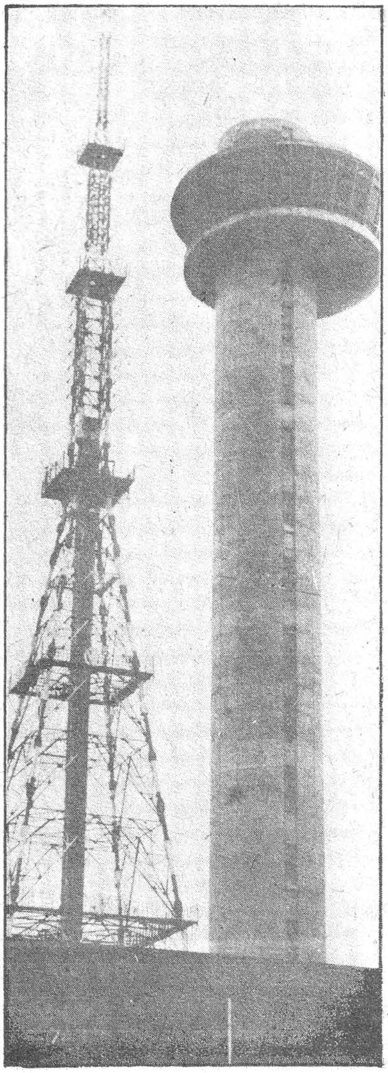

গল্ফগ্রীণে তৈরী হচ্ছে স্থায়ী দূরদর্শন স্টুডিও

সন্ধ্যা হলেই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বন্ধু ও বান্ধবীতে এবং পাড়াপ্রতিবেশীতে ঘর ভরে যায়। কাউকে নিমন্ত্রণ দিতে হয় না, সময় হলেই সব এসে ভিড় করে। ঠিক সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন স্ত্রী বা মেয়ে ঘরে প্রদীপ জ্বালাতো। টি ভি আসার পর তার পাঠ চুকে গেছে। এখন আমাকে সে কাজ করতে হয়। অতিথি, অভ্যাগত ও বন্ধু-বান্ধব এলে আপ্যায়ন এখন আমাকেই করতে হয়।

টি ভি যে দিল্লি কা লাড্ডু – যে পেয়েছে সে পস্তিয়েছে, আর যে না পেয়েছে সেও পস্তিয়েছে।"

এই চিঠিটি সাধারণভাবে সকলের মনের কথাই বলছে। টি ভি সম্প্রসারণের দৌলতে শহর ও মফঃস্বলে একই অবস্থা হয়েছে। টি ভি নামক আধুনিক বিজ্ঞানের এই অবদানটি এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে কে জানত! সন্তানদের লেখাপড়া, গিন্নীর কাজকর্ম মাথায় উঠেছে, অকারণে আপ্যায়ণ খাতে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এমন কি বাড়িতে টি ভি না থাকলে সে বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া আর লটারির প্রথম পুরস্কার পাওয়া দুই-ই

সমান ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শহর কলকাতায় এখন কাজের লোকেদের অন্যতম দাবী হচ্ছে, বাড়িতে কালার টি-ভি অবশ্যই থাকা চাই। থাকলে সে নিজের পারিশ্রমিক কম নিতেও রাজি আছে। রঙিন টি ভি দেখার আনন্দই নাকি অন্যরকম। শুধু তাই নয়, আপানর যত ফাই-ফরমাশ সব সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে সেরে নিতে হবে। তখন থেকেই গৃহকর্মীটি দূরদর্শন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো মাথায় ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ছোটদের মাথা বিগড়ে দেবার মত অনুষ্ঠান টি ভি'তে হামেশাই হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান 'চিত্রহারের' এবং প্রতি রবিবারের হিন্দি ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণতঃ 'চিত্রহার' অনুষ্ঠানের গানের দৃশ্য ও হিন্দি ছবির অনুষ্ঠান ছোটদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। অথচ ছোটদের মগজ ধোলাই করার জন্য নিয়মিত এরকম অপসংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর। আজকের ছোট ছেলেমেয়েদের হিন্দী ছবির নায়ক নায়িকার নাম ও গান মুখস্ত বলা যেতে পারে। এই সব অনুষ্ঠান দেখার জন্য ছোট, বড় সবার যেরকম আগ্রহ, তাতে টি ভির কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

এসব ছাড়াও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুষ্ঠানে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ এখন প্রতিদিন দুটি করে বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত 'হামলোগ' মার্কা সস্তা দরের নাটক প্রচার করে থাকেন। এই জাতীয় সিরিয়াল দেখার জন্য সবরকম দর্শকেরাই মুখিয়ে থাকে। রাত এগারোটার আগে যার বিরতি নেই। আপনার আদরের সন্তানটিই বা এর দর্শক হবে না কেন? সুযোগ সুবিধা পেলে কি সমবয়সীদের সঙ্গে খেলবার সময় তার প্রিয় খেলা যদি 'স্পাইডারম্যান' সাজা হয় তবে কি আপনি খুব অবাক হবেন? শিশু মনের বিকাশ ঘটে অথবা তার পঠন-পাঠনে কোন উপকার হয় এমন কোন অনুষ্ঠান টি ভিতে পাওয়াই যাবে না। নিয়মরক্ষার্তে দিল্লিওয়ালারা শিক্ষামূলক একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন, কিন্তু তা শোনে কজন ছাত্র? দুপুর বারোটার সময় প্রচারিত হয় অনুষ্ঠানটি তখন সব ছাত্রই থাকে স্কুলে, আবার বিকাল চারটেয় ঐ অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হয়—তখনই বা কজন ছাত্র শোনার জন্য আগ্রহী হয়? তাছাড়া অনুষ্ঠানটির সর্বাংগে দীনতার ছাপ এতই প্রকট যে তা কারোকেই আকর্ষিত করতে পারে না। সুতরাং আপনার অপরিণত সন্তানটির অন্যতম মানসিক খাদ্য আজ হয়েছে অপসংস্কৃতি। এবারে পরীক্ষায় সেই সন্তান যদি ফলাফল খারাপ করে তাহ'লে কি আপনি ক্রুদ্ধ হবেন? সন্তানের কি দোষ বলুন? তাকে যা দেখানো হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে সে তো তাই শিখবে। অনুসন্ধানে জানা গেছে এ রাজ্যে টিভি'র সূচনা হবার পর থেকে ছাত্রদের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হয়েছে।

শুধু ছাত্র কেন, গত দশ বছরে কি খারাপ হয় নি, আঞ্চলিক ভাষার চিত্রজগতের অবস্থা? টি ভি চালু হওয়ার পর থেকে কি খারাপ হয় নি, সাংস্কৃতিক জগতের অবস্থা? প্রতি শনি ও রবিবার দূরদর্শনে বাংলা ও হিন্দি ছবি দেখানো হয়ে থাকে। যে দিন উল্লেখযোগ্য ছবি থাকে সেইদিনই সিনেমা কি রংগমঞ্চের টিকিট বিক্রির হার অর্ধেকেরও বেশি কমে যায়। এ নিয়ে স্বনামখ্যাত অনেক গুণীজনই বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রতিবাদ করেছেন, তাতে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ কান দেন নি। চলচ্চিত্র শিল্পের নিধন কর্ম তারা খুব ভেবে চিন্তেই চালিয়ে যাচ্ছেন! সেই সংগে চালিয়ে যাচ্ছেন, হিন্দিকে একমাত্র জাতীয় ভাষার তকমা পড়ানোর চেষ্টা। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের শতকরা আশিটি অনুষ্ঠানের ভাষাই হলো হিন্দি। এইসংগে দলীয় প্রচার কার্যে দূরদর্শনকে ব্যবহারের অজস্র অভিযোগ তো রোজই উঠছে।

শোনা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ এখন খুবই বিপদে পড়েছেন। বিপদ একটি নয় দুটি। প্রথমটি হলো বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দূরদর্শনে দেখানোর একটি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হলো যে সব পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সরাসরি কেন্দ্রকে আঘাত করেছে অথবা বামপন্থী রাজনীতি প্রচার করেছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে। সরকার তো আর পয়সা খরচ করে নিজে সমালোচনা নিজেই দেখাতে পারে না বা বিরোধীদলগুলোর হাত শক্ত করতে পারে না? তাই কর্তৃপক্ষ চিন্তিত।

দ্বিতীয়টি হলো, চলচ্চিত্র সেন্সার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি খুবই উদার হয়েছেন। তারা এখন বহু ছবিতে চুম্বন দৃশ্য দেখানোর অনুমতি দিচ্ছেন। শুধু তাই নয় ঐসব ছবি পাচ্ছে, 'ইউ' সার্টিফিকেট অর্থাৎ কিনা সর্বজনের দর্শনীয় ছবি। এখন ঐসব ছবির প্রযোজকরা যদি টি ভি'তে তাদের ছবি দেখাতে চান তাহ'লে কর্তৃপক্ষ কি করবেন? চুম্বন দৃশ্য বাদ দিয়ে তারা কি ছবি দেখাবেন? না, কি চুম্বন দৃশ্য থাকবে? সব ছবিতো সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' নয় যে চুম্বন দৃশ্য থাকলেও তা নিয়ে সোরগোল হবে না।

ভবিষ্যতের কর্মসূচী নিয়ে এখন না ভেবে বর্তমানে দূরদর্শনে কিরকম অপরিণাম দর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে —— তার সার্থক নমুনা হিসাবে তুলে ধরা হলো আরেকটি চিঠি। যেটি গত ২১ আগষ্ট 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'দূরদর্শনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ' এই শিরোনাম দিয়ে চিঠিটি লিখেছেন সল্ট লেক থেকে অশোক সেনগুপ্ত।

"গত রবিবার ১৮ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দূরদর্শনে বাংলা সংবাদে অন্যান্য সংবাদের সংগে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত এক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। সংবাদের সংগে টেলিভিশনের ক্যামেরায় তোলা ছবি এই সংগে দেখিয়ে সংবাদের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। ছবিতে লাইগেশানের জন্য শয্যাশায়ী কয়েকজন মহিলাকে দেখানো হলো, তারপরে বহুপুরুষ তাদের সামনে দণ্ডায়মান দেখা গেল। সর্বাধিক নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক দৃশ্য দেখান হলো একজন মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় এবং তাঁর গোপন অংগ। এমন দৃশ্য যে টি ভি'-তে দেখানো যেতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেন না, স্বভাবতই বিস্ময়ের সংগে লজ্জায় সকলে চোখ সরিয়ে ফেললো। 'টি ভি'র সংবাদ বিভাগ কতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং মহিলাদের প্রতি মর্যাদাবোধহীন হলে এরূপ অশালীন ছবি দেখাতে পারে।

প্রশ্ন জাগে টি ভি যখন ঘরে বসে সপরিবারে দেখার, তখন সম্পাদনা না করে যাতা দেখানোর ছাড়পত্র সংবাদ বিভাগ পায় কি করে? লাইগেশন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্তরা টি ভি-র ক্যামেরাম্যানকে এরকম ছবি তুলতে দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কাজ করলেন এটাও প্রশ্ন। এ ব্যাপারে টি ভি কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নেয় দেখবার বিষয়।"

অতঃপর শুধু একটা কথাই বলা যেতে পারে – সাধু সাবধান, টি ভি থেকে নিজে এবং পরিজনদের দূরে রাখুন।। □

তপন রায়

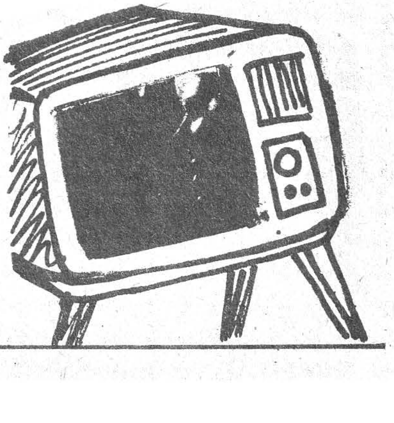

চাহিদা মেটাতেই হিমসিম

সোনোডাইন

অন্ততঃ কলকাতার বাজারে সোনোডাইনের টিভির কাছে কেউ নেই। ওদের চাহিদা এত যে ঠিক মতন খুচরো দোকানে মাল সরবরাহ করা যায় না। কিছু রিটেলারদের ধারণা সোনোডাইন ম্যানেজমেন্ট ইদানীং টিভি উৎপাদনের উপর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁদের বক্তব্য যদি দশটা টিভির অর্ডার দেওয়া হয়, তাহলে ওরা পাঠায় একটা। এতে ব্যবসা চলে কি করে? কেউ কেউ বললেন ওঁরা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু এটা মান্ধাতার আমলের চিন্তাধারা। কাস্টমার যদি প্রোডাক্টই না পায় তাহলে অন্য মাল নেবে।

সোনোডাইন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ আমরা চাহিদা অনুযায়ী মাল দিতে পারছি না। তার কারণ প্রচন্ড চাহিদা। এটা আসলে ভাল টিভির চাহিদা। তাই আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। খুব শ্রীঘ্রই টিভি উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানো হচ্ছে।"

নিউ আলীপুর টাঁকশালের সামনের রাস্তা দিয়ে ঢুকলে বোরোলীনের পরই সোনোডাইনের অফিস। আর একটু গেলে ওদের টিভি কারখানা। ওখানেই সোনোডাইন টেলিভিশন কোম্পানীর দুই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর অশোক আইকত ও অশোক মুখার্জীর অফিস। সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির যেমন সাজানো অফিস হওয়া উচিত সবই আছে। তবে প্রতিষ্ঠা আর বনেদীয়ানা এক নয়। তবু বাঙালী দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সত্তর দশকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক কাপ চা খেতে খেতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সার্থক রূপায়ন গর্বের বৈকি। বিশেষ করে সত্তর দশকে যখন কলকাতায় কোনও শিল্প শ্রমিক অশান্তির জাল এড়োতে পারেনি সেখানে এক আদর্শ শিল্প সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠানকে আজ শুধু দেশে নয় বিদেশেও সুপ্রসিদ্ধ করে তুলেছেন। অবশ্য এই কোম্পানির সুরুয়াত আর একটা ধর্মঘটের পরিণতি বলা যেতে পারে। ১৯৬৯ সালের আগস্ট এই দুই ইঞ্জিনীয়ার যখন জি.ই.সির ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন, শ্রমিকরা ধর্মঘটের হুমকি দেওয়ায় মালিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য লেআজার ঘোষণা করেছেন, সেদিন কারখানার গেট থেকে

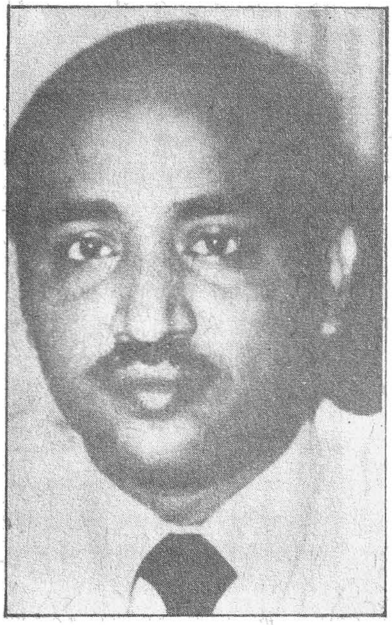

শ্রী এ. মুখার্জী

বেরিয়ে দুই বন্ধু একটি চায়ের দোকানে বসে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, আমরা নিজেরাই কিছু করবো। তারপর সোজা ডাইরেকটরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে খোঁজখবর নেওয়া, অর্থের জন্য হেঁটে ব্যাংক যাওয়া, রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউটে। মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে ওঁদের স্বপ্ন যে পরিণতি লাভ করবে তা ওঁরা ভাবতেও পারেনি ইতিমধ্যে জি.ই.সি ছেড়ে আইকত এইচ এম ভিতে আর মুখার্জী রুরকীতে চাকরী নিয়েছিলেন। দুজনে একসঙ্গে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে সোনোডাইনের প্রতিষ্ঠা করলেন। দুজনের পার্টনারশিপে ১৯৭০ সালে সোনোডাইন কর্পোরেশন স্থাপিত হলো। স্টেট ব্যাঙ্ক টাকা দিল। তৈরি হতে শুরু করলো ব্যাটারি এলিমিনেটর। ৭০ থেকে ৭১-এ এসে এরা স্টিরিও এমপ্লিফায়ার ও স্পীকার তৈরি শুরু করেন। এই স্টিরিও ও হাইফাই সিস্টেম তাঁদের বাজারে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। বলতে গেলে সোনোডাইনের পরিচিতি সেখানেই। প্রথম বছর ওঁদের কেনাবেচা হয়েছিল ১.৫ লক্ষ টাকা। পরের বছর ৫.৪ লক্ষ টাকা। তারপর শুধু ওপরেই ওঠা। ১৯৮৩-৮৪ সালে দশ কোটি ছাড়িয়ে গেল। অবশ্য এই বছর প্রথম ওঁরা সোভিয়েত রাশিয়া থেকে দুকোটি টাকার হাইফাই সরঞ্জামের অর্ডার পেলেন। এতে কোম্পানির তরুণ ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আরও ভাল জিনিস তৈরি করার উৎসাহ বাড়লো।

৮৪-৮৫ তে কেনাবেচা ১৩ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেল। এ বছর ওদের লক্ষ্য আরও উপরে। গতবছর থেকে ওঁদের টিভি বাজারে যথেষ্ট সুনাম নিয়ে বিক্রী হচ্ছে। ওঁদের ২০০০ সালে কেনাবেচা ৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এর মধ্যে আরও পাঁচটা ফ্যাকটরী হবে।

১৯৭৫ সালে সোনোডাইন টেলিভিশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়, ৭৭ সাল থেকে ওঁরা রপ্তানি শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে ক্যাসেট টেপ ডেক তৈরি শুরু করেন। ১৯৮০ তে রেকর্ড প্লেয়ার এবং ৮২তে বোম্বের সান্তাক্রুজ ফ্যাক্টরিতে হাইফাই স্টিরিও তৈরি শুরু হয়। ওই বছর কলকাতায় এশিয়াডের জন্য কিছু রঙীন টিভি তৈরি করা হয়। ৮৩ সালে আমেরিকার ডলবি লেবোটরিজের সহযোগিতায় ক্যাসেট টেপ তৈরি করেন। সেই সঙ্গে পোর্টেবলস্টিরিও।

তিনটি কোম্পানি সোনোডাইন ইলেকট্রনিক্স ও সোনোডাইন টেলিভিশন যেটি কলকাতায় অবস্থিত। সোনোডাইন ইন্টরনাশানাল কোম্পানি বোম্বের সান্তাক্রুজ ইলেকট্রনিক এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে অবস্থিত।

সোনোডাইনের মুখপাত্র জানালেন, বাজারে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির চাহিদা খুব বেশি। এবং এটা বাড়বে, তার কারণ সেমি আরবান এলাকার মানুষ সস্তায় ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি চাচ্ছেন সোনোডাইনের ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি ২১১৮ টাকায় বেচছেন। দাম একটু বেশি। কিন্তু সার্ভিসের জন্য গ্রাহককে এতটুকু ভাবতে হবে না। আসলে মান উঁচু রাখতে হলে দাম একটু বেশি পড়ছে।

একটি টিভি ট্রেডিং কোম্পানির কর্ণধার জানালেন যদি নামী কোম্পানীগুলি ছোট টিভির উপর শতকরা ৪০০ ভাগ মুনাফার প্রবণতা কমায় তাহলে সস্তায় টিভি সাধারণ মানুষের কাছে পৌছতে পারে। আসলে বিজ্ঞাপন ও প্রচার এই সব কোম্পানি প্রতি সেটে ২০০/৩০০ টাকা খরচ করে থাকেন।

সোনোডাইনের মুখপাত্রটি বললেন আমরা চাই টিভির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ভাল টিভি সাধারণ ঘরে যাক। যাতে খারাপ হবার সম্ভবনা কম।

বাজারে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা কালে তিনি স্বীকার করলেন সাউথ এশিয়ার বাজারে টিভি যন্ত্রাংশের অভাবের কারণ এবং সেই সঙ্গে চীনের বাজারে টিভির চাহিদা।

সোনোডাইন জাপানি একটি কোম্পানির সহযোগিতায় রঙীন টিভি তৈরি করছেন, যার ন্যূনতম মূল্য হবে ৭৬২৫ টাকা। তাছাড়া ওঁরা ভিডিও তৈরি করছেন।

বছর দুয়েক আগে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ডিরেকটর ডাইজেস্ট'-এ এক সাক্ষাৎকারে আইকত ও মুখার্জী দুজনেই স্বীকার করেছিলেন যে আমরা বিদেশের বস্তাপচা পুরাতন কারিগরি ব্যবহার করি না। বরং অনেকক্ষেত্রে সোনোডাইন বহু অর্থ ব্যয়ে গবেষণা চালিয়েও পরে তা উপযোগী হবে না এই ভেবে বাতিল করেছেন। আসলে গবেষণার ব্যাপারে ওঁদের নজর আছে।

সোনোডাইনের একজন মুখপাত্র গর্ব করে বললেন আমাদের টিভির কালার যেকোনও বিদেশি টিভির সমান। অবশ্য এতটা সার্টিফিকেট দেশে তৈরি কোনও টিভির উপর ইলেকট্রনিক রিজিওনাল টেস্ট ল্যাবরেটরীর ডিরেকটর গ্রুপ কাপটেন মানস মুকুটমণি দিতে চান না। তার কারণ অর্থবহুল গবেষণা চালানো কোনও টিভি নির্মাতার পক্ষে সম্ভব নয় বলে।

ওই সাক্ষাৎকারে শ্রী আইকত টিভির দাম কমানোর একটা মেডইজি দিয়েছেন, তাহলে সরকারের উচিত টিভি থেকে সমস্ত রকম শুল্ক মকুব করা। তাঁর মতে এখন একটা টিভির যা দাম তার ১৬০ ভাগ শুধু বিভিন্ন শুল্ক দিতে খরচ হচ্ছে। এটা কমলেই দাম কমবে।

সাধারণ মানুষের জন্য টিভি তৈরির এই প্রসংশনীয় প্রয়াস সম্পর্কে সোনোডাইনের অন্যতম ডাইরেকটর শ্রী আইকতের কাছে গিয়েছিলাম জানতে। তাছাড়া একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠানের এই বিরাট সাফল্যের অনুভূতিটুকু তাঁকে জানাবার ইচ্ছা ছিল। সাক্ষাৎকার দেননি। কারণ জানি না। ইংরেজী পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনও পত্রিকা সম্বন্ধে নাকি আগ্রহী নন। এর আগে 'ডিরেকটর'স ডাইজেস্ট', 'ক্যাপিটাল,' ইকনমিকস টাইমস' প্রভৃতিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বার বার জাপান যাচ্ছেন, যাতে সাধারণ মানুষকে কি ভাবে ভাল ও সস্তায় টিভি দেওয়া যায় তার জন্য। অথচ সাধারণের ভাষায় যাঁরা লেখেন তাঁদের প্রতি অনীহা বোধগম্য নয়। আমরা সাধারণের জন্য লিখি, ওঁরা সাধারণের জন্য টিভি তৈরি করেন। দুজনেরই একই লক্ষ্য কি ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায়। তাহলে কথা বলতে আপত্তি কোথায়? □

কমপিউটার থেকে টিভি

টেলিভিস্টা

প্রখ্যাত টিভি প্রস্তুতকারক সংস্থা টেলিভিস্টা খুব শীঘ্রই কলকাতায় তাদের টিভি উৎপাদন কেন্দ্র খুলছেন। যদি কলকাতায় টিভি প্রস্তুত হয় তাহলে টি.ভির. মূল্য শতকরা ২০ ভাগ কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টেলিভিস্টা ইলেকট্রনিকস্‌ প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম ডিরেকটর প্রেম লুথরা এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার টিভি প্রস্তুত-কারকদের জন্য তিন বছর যে বিক্রয়কর রেহাই দিয়েছেন তার সঙ্গে যদি 'ক্রুডনেম' ব্যবহারের ওপরও কর রেহাই দেওয়া হয়, তাহলে টেলিভিস্টা তাদের দিল্লি ছাড়াও কলকাতায় আরও একটি টিভি তৈরি কারখানা প্রস্তুত করতে পারেন।

১৯৬৭ সালে দেশে টিভি চালু হবার সময় যে তিনটি অন্যতম টি.ভি প্রস্তুতকারক সংস্থা ছিলেন তাঁদের অন্যতম টেলিভিস্টা। পশ্চিম জার্মানীর সহায়তায় ১৯৬৮ সালে যেখানে বছরে পাঁচ হাজার টিভি প্রস্তুত হতো তা চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ১ লক্ষ ২০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে লুথরা আশা প্রকাশ করেন।

লুথরা জানান, ১৯৮০ সাল থেকে দেশে টি ভি প্রস্তুতকারক সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও

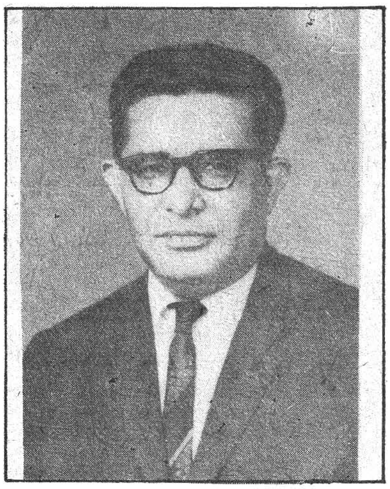

ভি. পি. লুথরা

১৯৮৪ সালে দেশে অনেকগুলি টি ভি কেন্দ্র স্থাপনের পর টি.ভি সেটের কমতি দেখা যায়। তিনি একথা অস্বীকার করেন যে, দেশে তথা পূর্বাঞ্চলে টি ভির বাজারে স্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে, তার মতে বাজারের চাহিদা দিনকে দিন বাড়ছে এবং এই কারণেই শুধু পশ্চিমবঙ্গে ১৭ টি টিভি প্রস্তুতকারক সংস্থা উৎপাদন শুরু করেছে। তিনি অবশ্য কিছু ভুয়া প্রস্তুতকারকদের সম্বন্ধেও সতর্ক করে দিয়েছেন, বিদেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে যারা শুধুমাত্র জোড়া লাগিয়ে বাজারে টিভি ছাড়ছেন, লুথরা আরও জানান যে টেলিভিস্টা কলকাতা বাজারে মাত্র ১৯৫০ টাকায় ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি এবং ৮৫০০ টাকায় ২০ ইঞ্চি রঙীন টি ভি বিক্রি করছেন। তিনি জানান, টেলিভিস্টা রঙীন টি ভির ক্ষেত্রে মাত্র ১ ভাগ ত্রুটি অভিযোগ তাঁরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টি ভিতে কোনও ত্রুটি ধরা পড়েনি।

বর্তমান পূর্বাঞ্চলে প্রতিমাসে মোট ১৫০০ টেলিভিস্টা টিভি বিক্রি হয়। এর মধ্যে কলকাতায় ৬০০। এছাড়া গৌহাটী শিলিগুড়ি, আসানসোলে তাঁদের বিক্রি বেড়েছে বলে তিনি জানান।

টেলিভিস্টা কোম্পানির মানেজিং ডিরেকটর বেদপ্রকাশ লুথরা ১৯৬৮ সালে টিভি প্রস্তত শুরু করেন, তার আগে তাঁরা রেডিও প্রস্তত করতেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় আলফা রেডিও এন্ড নভেলটিজ নামে ব্যবসা শুরু করেন। তার আগে ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর থেকে কলকাতায় ওঁরা চলে আসেন। বর্তমান সমগ্র দেশে তাঁদের মোট ২১টি শাখা রয়েছে। একজন ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞ বেদপ্রকাশ শুধু ভাল টিভি প্রস্তত করে বসেই থাকেননি, ১৯৭৯ সালে প্রথম মাইকো কমপিউটার নির্মাণ করেন যা হিন্দুস্থান কমপিউটারে ব্যবহৃত হয়। ১৫ হাজার থেকে শুরু করে ৪ লাখ পর্যন্ত তাঁরা বিভিন্ন দামের কমপিউটার নির্মাণ করছেন। এছাড়া ক্যালকুলেটর, টেপরেকর্ডার, টু ইন ওয়ান এবং সর্বশেষে ১৯৮২ সাল থেকে তাঁরা ভিডিও নির্মাণ করছেন। বর্তমানে তাঁদের ব্যবসায় বেচাকেনা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটি টাকায়। □

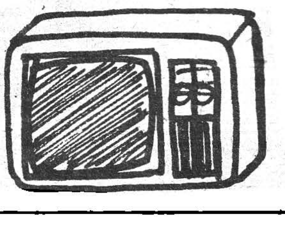

নামেই যাদু

আরসন

সনি নামেই যাদু আছে। আসলে ফিলিপসের মতন সনি বললেই বোঝায় ভাল ইলেকট্রনিক জিনিস। সমগ্র বিশ্বে সনি'র জয়জয়কার। আরসন ইলেকট্রনিক লিমিটেডের চেয়ারম্যান প্রবাসী ভারতীয় তরুণ শিল্পপতি মনু ছাবারিয়া এই যৌথ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করতেই লোকের মনে একটা স্বস্তি আসে। যাক তাহলে বিশ্বমানের টিভি দেশে পাওয়া যাবে। এর আগে ফিলিপস পি. এইচ এক্স নামে টিভি তৈরি করলেও 'সনি' নামের যাদু যে লোককে টেনেছে সেটা গত এক বছরেই সনি-আরসন টিভি বিক্রি দেখলে বোঝা যায়। চলতি বছর ৮৪-৮৫ তে আরসনের কেনা বেচার লক্ষ্য ছিল ১৫ কোটি টাকার। তাছা পিয়ে ২৩ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ওঁদের আশা ৮৫-৮৬ তে কেনাবেচা ৭০ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

সনি-আরসন ইলেকট্রনিকসের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক মানেজার সরোজরঞ্জন মহান্তী তাঁর উডবার্ন রোডের ঝকঝকে অফিসে বসে জানালেন, গতবছর শুধু পূর্বাঞ্চলে বেচাকেনা হয়েছে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। প্রতিমাসে কলকাতা অফিস থেকে পূর্বাঞ্চলে টিভি সেট বিক্রি হয় প্রায় ১২০০। চাহিদা রয়েছে আরও এক হাজার সেটের।

সনি সেট বিক্রির মূল কারণ আফটার সেল সার্ভিস। এব্যাপারে কোম্পানি সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এক বিরাট সেট ওয়ার্ক তৈরি করেছেন। এমনকি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গহন অঞ্চলে বা সুদুর গ্রামাঞ্চলে তাঁরা সার্ভিস সেন্টার করেছেন অথবা টেকনিসিয়ান পোস্ট করেছেন। কলকাতা সহ পূর্বাঞ্চলে প্রধান সার্ভিস স্টেশন ৬টি। যেমন রাঁচী, কটক, গৌহাটী, আসানসোল ও শিলিগুড়ি। এছাড়া একজন টেকনিসিয়ান আছেন এমন স্থান হলো পাটনা, রাউরকেল্লা, সম্বলপুর, বরহমপুর, পুরুলিয়ায় রঘুনাথপুর, ভাগলপুর, শিলং, ডিব্রগড়, ধানবাদ, মুর্শিদাবাদ ও ডিমাপুর। আগামী বছরের মধ্যে আরও ২০টি টেকনিসিয়ান সেন্টার খোলা হচ্ছে। এরা প্রত্যেকেই সনি ফ্যাকটরীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিজস্ব টেকনিসিয়ান। পূর্বাঞ্চলে ওদের ২০০ ডিলার রয়েছে। এছাড়া চলতি বছরেই রাঁচী, কটক ও গৌহাটীতে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হবে।

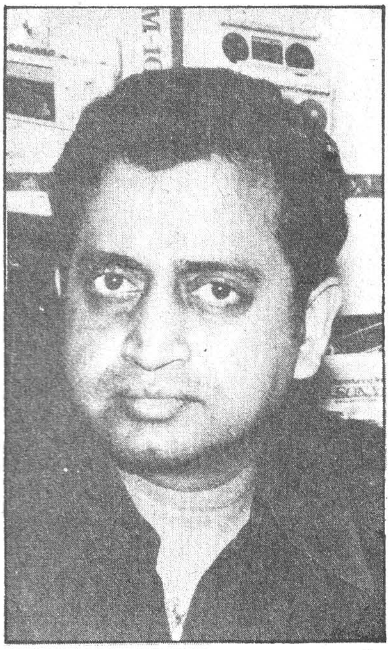

সরোজরঞ্জন মহান্তী

মহান্তী জানালেন, সনি-আরসন তাদের বোম্বাইএ আন্ধেরী কারখানায় মাসে দশ হাজার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ও রঙীন টিভি তৈরি করছেন। এছাড়া আন্ধেরীর কাছে নিহান ইলেকট্রনিকস নামে আর একটি কারখানা হচ্ছে যা ডিসেম্বরে টিভি উৎপাদন শুরু করবে। ওখানেও মাসে ৫/৬ হাজার টিভি তৈরি হবে।

মহান্তী জানালেন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ১৪ ইঞ্চি টিভির প্রচন্ড চাহিদার জন্য সনি-আরসন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ২৬০০ টাকায় টিভি বাজারে ছাড়ছেন।

এছাড়া ঔরঙ্গাবাদ ট্রিনিটন নামে রঙীন টিভি তৈরি করছেন বলে উনি জানালেন। কলকাতায় কারখানা স্থাপন সম্পর্কে আঞ্চলিক অফিস থেকে একটি প্রস্তাব চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়েছে, এবং এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

তিনি টিভির মূল্য কমানোর ব্যাপারে পক্ষপাতী নন। বরং জানালেন, ভাল সার্ভিস ব্যবস্থার জন্য তাঁরা যথেষ্ট খরচ করছেন, যাতে লোকে সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিস পায়।

এখনও পর্যন্ত সনি-আরসনের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির কোনও অভিযোগ ওঁদের কাছে আসেনি। তবে রঙীন টিভির ক্ষেত্রে মামুলী অভিযোগ পাচ্ছেন, সংখ্যা খুবই নগণ্য।

কি করে অন্য টিভি কোম্পানি টিভির কালার দর্শকের চোখে যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য বিশেষ চিন্তাভাবনা করছেন। টিভির কালার প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যায়। সাধরণতঃ সনি-আরসন রঙীন টিভি একটু লালচে ছবি হয়। এটা গ্রাহকরা পছন্দ করেন।

পঃ জার্মানীতে শিক্ষিত মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার মহান্তী জানালেন, দেশের লোক এখনও রং সম্পর্কে সজাগ নন। তবে সনি-আরসন এ ব্যাপারে আগে থেকেই নজর রেখেছে।

মহান্তি দেশে নতুন নতুন বিদেশী টিভি কোম্পনির আগমন ও উৎপাদন শুরু করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে 'ব্রান্ডনেম শুল্ক' মকুব অবশ্যই করা উচিত। তাতে অনেক ভাল ভাল কোম্পানি এই রাজ্যে আসতে পারবে।

জাপানের প্রসিদ্ধ সনি কোম্পানির ৪০ শতাংশ শেয়ার মালিক দুবাইএর এই প্রবাসী ভারতীয় মনু ছাবারিয়া তাঁর নিজের জাম্বো ইলেকট্রনিকস নামে একটি কোম্পনি মধ্যপ্রাচ্যে ভাল ব্যবসা করছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় দেশে সনি-আরসন টিভি। এই কোম্পানির অন্ততঃ দুজন ডিরেকটর জাপানী। অন্তত কাজ আধডজন জাপানি বিশেষজ্ঞ বোম্বাইএর কারখানার কাজ দেখছেন। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। সরাসরি সনির যন্ত্রাংশ এনে পরিপূর্ণ ধূলোবালি মুক্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কারখানায় অত্যন্ত আধুনিক গবেষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সনির টিভি, স্টিরিও, ওয়াকমান প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। এঁর উপর বেশ কিছু ফিলিপসের দক্ষ অধিকর্তারা এখানে যোগ দিয়েছেন যার অন্যতম হলেন কোম্পানির মানেজিং ডিরেকটর এস ভাটিয়া।

১৯৮১ সালে নভেম্বরে বোম্বাইএ কারখানা প্রতিষ্ঠার পর ক্যাসেট, এমপ্লিফায়ার, স্পীকার স্টিরিও মোনো টু ইন ওয়ান তৈরী হতো। গতবছর আগস্ট থেকে টিভি নির্মাণ শুরু হয়।

পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক মানেজার মহান্তী নিজেও ফিলিপস ছেড়ে যোগ দিয়েছেন। ১৯৭০ সালে পঃ জার্মানীর লুবেক থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারশিপ করে লারসো টুবরোয় যোগ দেন। পরে ফিলিপসের প্রোডাকসন মানেজার। ওঁর স্ত্রী ওই অফিসেই বিজ্ঞাপনের কাজ সামলাচ্ছেন দক্ষতার সঙ্গে। এমনি ভূবনেশ্বরের অধিবাসী হলেও দুজনেই ভালো বাংলা জানেন এবং বাংলাকে ভালবাসেন।□

টেলেরামা

কলকাতার গর্ব

টেলেরামা টিভির অন্যতম কর্ণধার অরূপ চৌধুরী মনে করেন যে কোনও টিভি শুধু ভাল ছবি দিলেই তার বাজার ভাল হয় না। যদি কেনার পর সার্ভিসের ব্যবস্থা ভাল না হয় ক্রেতা খুশি হন না। টেলেরামা বা দেবসনস সেলস আফটার সার্ভিসের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। টেলেরামা ১৯৭৯ সালে বাজারে এসেছে কিন্তু দেবসনস ১৯৬৮ থেকে টেলিভিস্টা টিভির ডিস্ট্রিবিউটার ও সেলস সার্ভিস শুরু করায় তাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। তাই লোকে এখনও টেলিভিসটা আর টেলেরামাকে একই কোম্পানি মনে করে। কারণ শুধু ভাল সার্ভিস। কলকাতায় ৪০ জন দক্ষ টিভি কর্মচারি মোটর সাইকেল নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত কখন টিভি গ্রাহকদের কাছে থেকে কল আসে। সাধারণত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই এরা পৌছে যায় বাড়ি বাড়ি টিভি মেরামত করতে।

পশ্চিম জার্মানীর আই.টি.টির কারিগরি সাহায্যে প্রস্তুত এই টেলেরামা ইতিমধ্যে নামি-দামি কয়েকটা ব্র্যান্ডের অন্যতম টিভি কলকাতার গর্ব কারণ এটি এখানেই প্রস্তুত হয়। তারাতলা শিল্পাঞ্চলে তাদের যে ছোট গবেষণা কেন্দ্রটি আছে সেখানে অহরহ প্রচেষ্টা চলছে কি করে আরও ভাল টিভি বার করা যায়। গড়ে প্রতিমাসে তিন হাজার টিভি সেট তৈরি হয়। যার মধ্যে দু হাজার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, বাকী রঙিন টিভি। কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, আগামী কয়েকমাসের মধ্যে উৎপাদন হবে মাসে ৪৫০০ টিভি সেট।

অরূপ চৌধুরীকে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনারা কি মনে করেন, পূর্বাঞ্চলে টিভির বাজারে এক ধরণের স্থিতিস্থাপকতা এসেছে? উত্তরে শ্রী চৌধুরী জানালেন, এটা ঠিক পূর্বাঞ্চলের লোকের ক্রয়ক্ষমতা উত্তর বা দক্ষিন ভারতের মতন নয়। তাই একটি নির্দিষ্ট দামের টিভির জগতে বিক্রীতে ওঠা নামা দেখা দিচ্ছে। তবে তিনি মনে করেন না এখানে টিভির চাহিদা কমে আসছে। তাঁর মতে যদি কম মূল্যের ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি আরও বাজারে আসে তাহলে তার মার্কেট আছে। কারণ প্রথমত এটা কেনা সাধ্যের মধ্যে। দ্বিতীয়ত এই টিভি ব্যবহারকারী ট্রাক্টর ব্যাটারীতে পর্যন্ত চালাতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিহারের পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কথা উল্লেখ করে বলেন, ওখানে বর্ধিষ্ণু চাষীরা পর্যন্ত আজকাল টিভির প্রতি ঝুঁকেছেন। এরা দিনে ট্রাক্টর চালায় আর রাতে ওই ট্রাক্টরের ব্যাটারীতে টিভি দেখে।

১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির দাম আরও কমানো যায় কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, নতুন যে সব টিভি প্রস্তুতকারক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট খুলেছেন তারা রাজ্য সরকারের কাছে তিন বছরের জন্য বিক্রয় কর রেহাই পাচ্ছেন। ফলে বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রাংশ দিয়ে টিভি তৈরি করে সস্তায় দিতে পারছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। তিনি জানান টেলেরামা ২১০০ টাকায় এই সেট দিতে পারছেন এবং আশা করেন কয়েকমাসের মধ্যে এর দাম অন্তত ১৮০০ পর্যন্ত নামানো যাবে। টিভির দাম না কমার কারণ সম্পর্কে তাঁর মত ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। এক বছর আগে যেখানে ডলারের মূল্য ছিল ৮/৯ টাকা তা এখন ১৩ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে।

তবু তিনি ছোট টিভির বাজার সম্পর্কে আশাবাদী। তাঁর মতে বাজারে যেমন এক সময় টু ইন ওয়ান কেনার হিড়িক এসেছিল তেমনি ছোট টিভি কেনার হিড়িক বাড়বে। তখন বাজারের এই মন্দাভাব কেটে যাবে।

টেলেরামা এখন মাসে এক হাজার ছোট ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি তৈরি করে। তাঁরা এর উৎপাদন শক্তি বাড়াচ্ছেন। আগামী বছর চাহিদা অনুযায়ী এই টিভি পাওয়া যাবে।

শ্রী চৌধুরী রাজ্য সরকারের ইলেকট্রনিকস উদার নীতির প্রশংসা করে বলেন, এতে অন্তত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য দিল্লীর মুখাপেক্ষী হতে হবে না। যদি সল্ট লেক কমপ্লেকস গড়ে ওঠে এবং ছোট ছোট শিল্প গড়ে ওঠে তাহলে কলকাতায় যাঁরা টিভি প্রস্তুত করেন, তাঁদের সুবিধা হবে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, লাইসেন্স দেবার সময় এটা দেখা দরকার যে, প্রস্তুতকর্তা এখানেই সব মাল প্রস্তুত করছেন। তা না হলে দামী কোম্পানীগুলো তাঁদের অন্য রাজ্যে তৈরি যন্ত্রাংশ এনে শুধু এসেম্বল করে বিক্রি করবে। শুধু শুল্ক রেহাই-এর লোভে। এতে অন্য প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি বিপদে পড়বে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'ব্রান্ডনেম' শুল্ক মুকুবের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে এতে যেকোনও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী তাঁদের বিরাট বাজেট দিয়ে অন্য টিভি কোম্পানীর চাহিদার উপর প্রভাব ফেলতে পারেন। তাই সরকারকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে যাচাই করে নেওয়া উচিত যে তাঁরা প্রকৃত শিল্প গড়ে তুলেছেন না কেবল শুল্ক রেহাইএর সুযোগ নিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাল এনে শুধু জোড়া লাগিয়ে বিক্রী করছেন।

অরূপবাবু অবশ্য বলেন, তবে এটাও ঠিক যদি কোন প্রতিষ্ঠিত বিদেশী টিভি কোম্পানী এখানে শিল্প গড়তে চায়, তাদের অত্যাধুনিক কারিগরী দিয়ে টিভি বানাতে চায়, তাহলে তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। এতে টিভির মান যেমন বাড়বে, তেমনি বর্তমান বিশ্ব যে আধুনিক কারিগরী টিভিতে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে এখানেও বিশ্বস্তরের টিভি পাওয়া যাবে।

তিনি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে তিন বছরের বিক্রয় শুল্ক রেহাই দিচ্ছেন, রঙীন টিভির ক্ষেত্রে তা ৬ বছর বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ মাত্র তিন বছরে বিরাট বাজেট নিয়ে কেউ রঙীন টিভি শিল্পস্থাপনের ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির উপর এককালীন যে ১০০ টাকা শুল্ক ধার্য করা হয়েছে তা মুকুব করার জন্য অনুরোধ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তাঁর মতে রেডিওয় যেমন তিন ব্রান্ড পর্যন্ত লাইসেন্স মুকুব করা হয়েছে ছোট টিভির ক্ষেত্রেও তাই করা হোক। এতে ছোট টিভির দাম আরও ১০০ টাকা কমে যাবে।

টেলেরামা তাঁদের তারাতলা কারখানায় গবেষণা কেন্দ্রটি এ বছর সম্প্রসারণ করতে চান। এছাড়া সল্ট লেকে তাঁরা ২ একর জমি চেয়েছেন যাতে ১৯৮৭ সালের মধ্যে টিভি কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা যায়।

শুধু টিভি নয়, এবার টেলেরামা কিন্তু ইলেকট্রনিক কম্পুটার প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন। তবে সেটা কি তা এখনই অরূপ বাবু জানাতে চাইলেন না।

১৯৭৯ সালে যাদের কেনাবেচা ছিল মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা তা ৮৪-৮৫তে বেড়ে ৫ কোটিতে পৌছেছে। এবছর টেলেরামার লক্ষ্য ৭ কোটি টাকার ব্যবসা। □

অস্কার

একসঙ্গে টিভি, ভিডিও

কলকাতা বাজারে যে কটি টিভি খুব জনপ্রিয় তার মধ্যে অস্কার অন্যতম। পূর্বাঞ্চলে শতকরা ৩০ ভাগ টিভি ওদেরই বিক্রি হয়।

গড়ে প্রতিমাসে পূর্বাঞ্চলে সব ব্রান্ড মিলিয়ে প্রায় দশহাজার টিভি হয়। তারমধ্যে অস্কারের তিন হাজার এর মধ্যে শুধু কলকাতা বা পঃ বঙ্গে ১৬০০। অথচ দিল্লিতেই ওদের মাসে বিক্রি হয় পাঁচ হাজার সেট। অস্কার ১৯৮৪ সালে আগস্টে প্রথম দিল্লিতে টিভি প্রস্তুত করার কারখানা খোলে। পরে কলকাতা এয়ারপোর্টের কাছে রঘুনাথপুরে কারখানা।

অস্কার টিভির অন্যতম মালিক তরুণ মুকেশ আরোরা কলকাতার ছেলে ১৯৪৬ সালে ওরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এই কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। পড়াশুনা সবই কলকাতায়। দিল্লিতে কারখানা কারণ টিভির যন্ত্রাংশ ওখানে সহজলভ্য।

১৯৪৬ সালে বাবা পি এল স্বরূপ অরোরা কলকাতায় জেনারেল রেডিও কর্পোরেশনের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ওঁরা রেডিও বিক্রি করতেন। তারপর লাউডস্পীকার, অডিও তৈরি শুরু করেন। না হলেও অন্তত দশটি কোম্পানি ওদের পরিবারের লোকেরা চালান।

বলতে গেলে মুকেশের প্রচেষ্টায় এবং ওঁর অন্যতম পার্টনার কে কে কেজরিওয়ালার সহায়তায় ওঁরা টিভি প্রস্তুত করা শুরু করেন।

গত বছর ওদের টি ভি বিক্রি হয়েছে ৯ কোটি টাকার। এখন মাসে গড়ে ৮ হাজার টিভি সেট তৈরি হয়। মুকেশই জানালেন ৮৬-৮৭ সালে অস্কারের উৎপাদন দ্বিগুণ করে ২ লক্ষ সেট তৈরী করবেন।

রাজ্য সরকার ব্রান্ডনেম শুল্ক মকুব না করলে কোনও প্রতিষ্ঠিত টিভি কোম্পানী কলকাতায় কারখানা স্থাপন করবেন না। কারণ তাতে খরচ অনেক বেশি পড়বে। রাজ্য সরকারের নীতি অনুসারে যদি কোনও অন্য রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত টিভি কোম্পানি কলকাতায় টিভি প্রস্তুত করতে চান তাহলে তাকে অন্য কোন নতুন নামে টিভি বার করতে হবে। তা না হলে তাদের ক্ষেত্রে তিন বছরের বিক্রয় কর মকুব করা হবে না। যেহেতু অস্কার দিল্লিতে টিভি তৈরি করে তাই কলকাতায় তারা ওই নামে টিভি করতে পারবে না। বিক্রয় করের

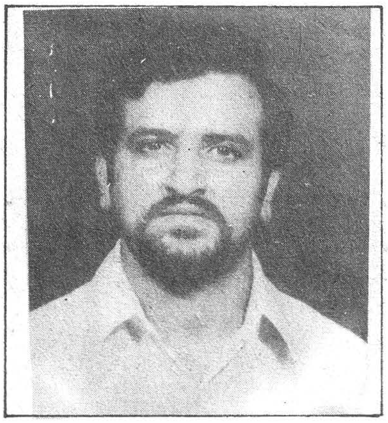

সুবিধা নিতে হলে অন্য কোনও নামে টিভি বার করতে হবে। মুকেশ আরোরার ক্ষোভ, দেখুন আমাদের মতন ছোট কোম্পানি পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের যে গুডউইল তৈরি করেছি এখন নতুন নামে টিভি বার করলে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আবার আমাদের বিরাট বাজেটের প্রচারে নামতে হবে।

তিনি স্বীকার করলেন, কলকাতা থেকে টিভি প্রস্তুত করলে উৎপাদন খরচ ১০ ভাগ কম করা যাবে। তাতে টিভির দামও কমানো যাবে।

কম দামের ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির বাজার সম্পর্কে তারা আশাবাদী যদিও অস্কারই প্রথম কোম্পানি যারা বাজারে কয়েক হাজার ১৪ ইঞ্চি সেট মাত্র ১২৫০ টাকায় বিক্রি করেছিলেন। অথচ তাদের ওই সেটের দাম ১৯২৫ টাকা। অস্কার যখন ১২৫০ টাকায় সেট বিক্রি করে, তখন বাজারে ওই টিভি লোকে প্রিমিয়াম দিয়ে দু হাজারে কিনেছে। আজ কোম্পানি নিজেই ১৯২৫ টাকায় বেচছে। দাম কমানোর যুক্তি সম্পর্কে মুকেশের বক্তব্য কোনও টিভির স্টান্ডার্ড ও সার্ভিস বজায় রেখে এর কমে টিভি বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিকস মাত্র ১৩৫০ টাকায় টিভি দেবে বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু অস্কার আরো কমে টিভি দেবার কথা ভাবছে না। তাছাড়া ওদের সেটের চাহিদাও প্রচুর। অস্কার ৭২৯৫ টাকায় ২০ ইঞ্চি রঙীন টিভি দিচ্ছে। জার্মানীর সার্পের কারিগরিতে এই রঙীন টিভি করা হয়েছে।

অস্কার বাজারে টিভি পিকচার টিউব এফ ৫৭ ও পিকচার এন্ড পিকচার যন্ত্র বার করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর কারিগরী সহায়তায়। এতে টি ভি চলাকালে স্ক্রীনে ভিডিও চালানো যাবে। অর্থাৎ টিভি ও ভিডিও এক সঙ্গে চলবে। বছরে দু লক্ষ সেট তৈরি হবে। □

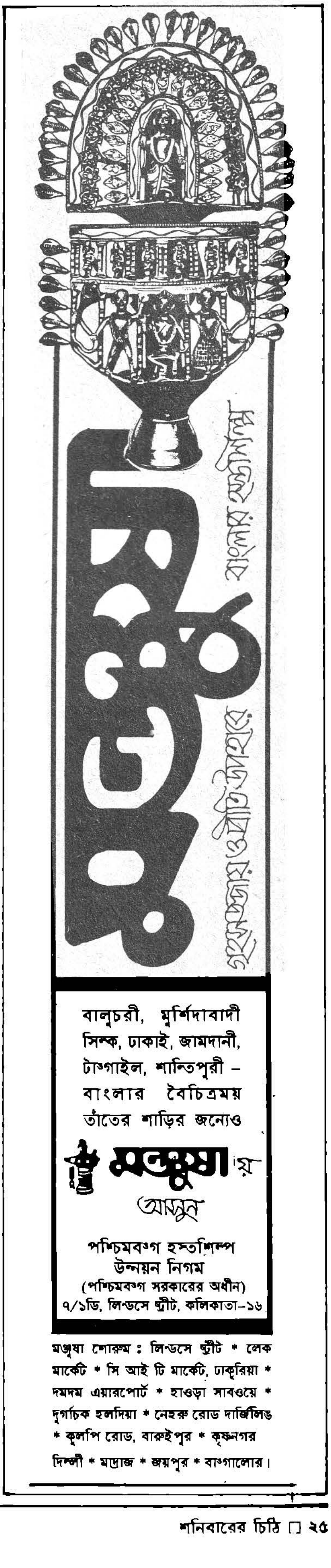

আইন ব্যবসায়ীর সাফল্য

ডিপট্রন

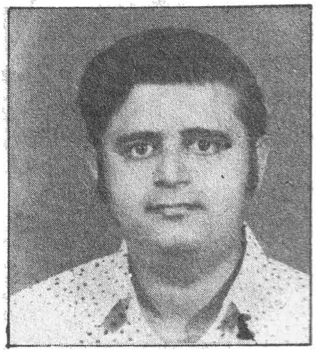

হাসমুখ কুণ্ডালিয়া

হাসমুখ কুণ্ডালিয়া কলকাতা হাইকোর্টে কাস্টমস ল, সেলস ট্যাক্স ল নিয়ে প্রাকটিশ করতেন। গত বছর থেকে। এ বছরের জানুয়ারিতে ওঁদের ট্যাংরার কারখানা থেকে প্রথম টিভি প্রস্তুত হয়ে বাজারে আসে। নাম ডিপট্রন। জানুয়ারিতে ১৬টি সেট তৈরি হয়েছিল। তার পরের মাসে ৫০টি এখন মাসে ১৫৬টি সেট তৈরি হচ্ছে।

পেশায় আইনজ্ঞ হওয়ায় হাসমুখের একটা মস্ত লাভ হয়েছে কাস্টমস থেকে মাল ছাড়ানোর। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট লাইসেন্স পলিসি যেমন মুখস্ত তেমনি কোন আইন বলবৎ হয়েছে, কোন কোন জিনিষ আমদানী ছাড় আছে সব ওঁর জানা। তাই এয়ারপোর্টে তাঁর মাল খালাস করতে অসুবিধা হয় না। তবু তিনি অন্যের অসুবিধার কথা স্বীকার করে বললেন, কাস্টমস অফিসের ঝামেলায় বহু কোম্পানীর মাল পোর্টে এনেও ছাড়াতে বিলম্ব হচ্ছে। তাই উৎপাদনে ব্যাঘাত হচ্ছে। তিনি জানালেন, অফিসাররা ভাল করে সংশোধিত আইনের ধারাগুলি পর্যন্ত পড়েন না। তাই যে মাল আমদানিতে রেহাই আছে, তাকেও আটকে রাখেন।

তাঁর ধারণা দেশে ১৯৮৬-৮৭ সালে টিভির অন্তত ৬০ শতাংশ অভাব দেখা দেবে। কারণ যা চাহিদা দাঁড়াবে তা আমাদের পূরণ করা সম্ভব হবে না। তাঁর মতে ওই সময় দেশে তিন কোটি টিভির চাহিদা হবে।

হাসমুখ সরকারী আমদানি নীতির সমালোচনা করে বললেন এতে অনেক ত্রুটি রয়েছে। বিদেশ থেকে যে কেউ এখনও ইচ্ছে করলে টিভি আনতে পারে। বছরে অন্তত চার লক্ষ টিভি এদেশে আনছে, অথচ এটা বন্ধ করে দিশি টিভি কেনার উপর সরকার গুরুত্ব দিতে পারতেন। সরকারি উদার নীতিতে অনেকে টিভি প্রস্তুত করেছেন বটে, কিন্তু কেউই টিভি নির্মাণ করছেন না, শুধু যন্ত্রাংশ জুড়ে চলেছেন। ফলে টিভির যন্ত্রাংশ এখানে তৈরির চেষ্টাই হচ্ছে না।

এতদিন সাউথ এশিয়ার বাজার থেকে 'কিট' এনে এদেশে টিভি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি চীনে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির প্রচন্ড চাহিদা বাড়ায় হংকং, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের বাজারে "কিটে"র অভাব দেখা দিয়েছে। যার প্রভাব এখানেও পড়ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত ইলেকট্রনিকসের সমালোচনা করে বললেন ওরা বড় কোম্পানিকে পিকচার টিউব সরবরাহ করছে। কিন্তু ছিট কারবারীদের চাহিদা অনুযায়ী মাল দিচ্ছেন না।

বিপুল এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে ডিপট্রন জানুয়ারিতে টিভি উৎপাদন শুরু করেছেন, অথচ আজও সেলস ট্যাক্স অফিস তাদের ট্যাক্স মকুব ডিক্লেয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেয়নি। সরকারী অফিসের এই গড়িমসি উৎপাদনে একটা বড় বাধা বলে তিনি জানান।

ডিপট্রন মাত্র ১৪০০ টাকায় ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি দিচ্ছেন। এর জন্য তাঁরা এডভান্স নিচ্ছেন না। এছাড়া এঁদের ২০ ইঞ্চি রঙীন টিভির দাম মাত্র ৬৮০০ টাকা আগামী ডিসেম্বরে ডিপট্রন মাসে ৫০০ টিভি তৈরির ক্ষমতা বাড়াচ্ছেন।

টিভি কোম্পানির মস্ত বাধা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া। যেহেতু টিভি প্রস্তুত করতে ক্যাপিটাল গুডস্ বেশি লাগে না রানিং ক্যাপিটালের প্রয়োজন। সেহেতু ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে গড়িমসি করে। ব্যাঙ্কের এই নীতি পাল্টানো উচিত বলে তিনি জানান।

আগামী মাসে ডিপট্রন একটি রঙীন নতুন মডেল টিভি বাজারে ছাড়ছেন, যাতে ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থা থাকছে বলে তিনি জানালেন। ☐

প্যানোরামা

ডীলার থেকে প্রডিউসার

গত বছর আগস্ট ভি.আই.পি রোডের ধারে এয়ারপোর্টের কাছে প্যানোরামা টিভির যাত্রা শুরু। এবং ভাল সার্ভিস ও ভাল সেট হিসাবে ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে।

প্রকৃতপক্ষে গত আগস্ট থেকে ওঁদের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি তৈরি শুরু হয়েছে। ১৪ ইঞ্চি সেটটি মাত্র ১৯৫০ টাকায় বিক্রী করছেন এঁরা। বলরামবাবু জানালেন গত ১২ মাসে তাঁরা ১২ হাজার সেট বাজারে ছেড়েছেন। আগামী মাসে ২০ ইঞ্চি রঙীন টিভি বাজারে ছাড়ছেন। যার দাম হবে মাত্র ৬০০০ টাকার কিছু বেশি। জাপানের তোশিবার যন্ত্রাংশ দিয়ে এটি তৈরি হবে। আগামী বছরের শুরুতে ওঁদের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে মাসে ২৫০০ সেটে।

শ্রীচৌধুরী কোনও বড় টিভি প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক মুকুবের সুযোগে এখানে শিল্প স্থাপনের বিরোধী। তাঁর মতে ওরা কেউই এখানে পুরো ইউনিট খুলবে না। ৩/৪টি পার্টস এনে কেবল জোড়া লাগিয়ে বেচবে। ওদের ওই বিরাট বাজেটের সামনে আমাদের মতন ছোট টিভি প্রস্তুতকারকরা দাঁড়াতে পারবে না। তিনি রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যাতে 'ব্রান্ডনেম' শুল্ক মুকুব করে কোনও বড় বা বিদেশী প্রস্তুতকারককে এখানে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

শ্রীচৌধুরী টিভির বাজার সম্পর্কে কোনও আশঙ্কা প্রকাশ করলেন না। তাঁর মতে ১৪ ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। লোকে ওই সেট কেনার সামর্থ্যও রাখে। তাই প্যানোরামা ব্যাটারি সেটে ওই টিভি তৈরির দিকে নজর দিয়েছেন। এতে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিদ্যুতের অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়বেন না।

তাছাড়া ওটি পোর্টেবল হওয়ায় লোকে হাতে করে সার্ভিস স্টেশনে এনে সারিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

ভি.আই.পি রোডে ১৫ হাজার বর্গফুট কারখানার প্রায় ১৫০ জন কর্মী কাজ করছেন। শ্রীচৌধুরী জানালেন, শুধু টিভি নয় প্যানোরামা ডায়াল টেলিফোন তৈরি করছে জাপানী কারিগরিতে। এর জন্য ২৫ লাখ টাকা ওঁরা খরচও করে ফেলেছেন। এ বছর প্যানোরামার ২ কোটি টাকার বেচাকেনা হয়েছে। আগামী বছরে এটা সাড়ে তিন কোটিতে দাঁড়াবে বলে তাঁর আশা।

প্যানোরামার অন্যতম কারিগরি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শ্রী এ.কে. বসু। এঁদের কলকাতায় ১৭ জন টেকনিশিয়ান আছেন, যাঁরা ফোন এলেই টিভি সারাতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান। ☐

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সংসারের সব দিকে সমান সচেতনতা থাকলে আমার জীবনের ছকটা অন্য রকম হত তাতে কোনো সংশয় নেই। বয়সটা অপেক্ষাকৃত কম হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বাপ-ঠাকুর্দার আমলের মনোভাব পাল্টায়নি। আধুনিক সমাজে পরিকল্পিত ভাবে পরিবার গড়ার দিকে নজর না দিয়ে ভাবের জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলার যা পরিণতি তারই সম্মুখীন হয়েছি। বিয়ের পর দশ বছর না-ছাড়াতেই চতুর্থ সন্তান সম্ভাবনার ইঙ্গিতে খুব বিব্রত বোধ করেছি। তার চেয়েও বড় কথা সুরূপার শরীরও বেশ কাবু হয়েছে। অতএব ভবানীপুরে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে হল। ওখানে মাদ্রাজী বড় গাইনী ডাক্তার পিল্লাই, ওকে দেখে বললেন—হাই ব্লাড প্রেসার, এনিমিয়া। গ্লুকোজ ও মিল্ক ইনজেক্শান দেওয়া দরকার।

ঢাকুরিয়া তখনও চিকিৎসার দিক দিয়ে তেমন উন্নত হয়নি। অগত্যা শিশুমঙ্গলের আউটডোরেই ইনজেকশনের জন্যে ওকে নিয়ে যেতাম। তখন ল্যান্সডাউন রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের ওই প্রতিষ্ঠানটিতে কেবল প্রসূতি আর শিশুদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগ ও সেবাব্রতে আকৃষ্ট সাধারণ মানুষের দানেই পরবর্তীকালে এর সম্প্রসারণ ঘটে মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সতীর্থ ভগবান চক্রবর্তীর পৌত্র শ্রীমান ভবেশচন্দ্র বংশানুক্রমিক নিয়মে জুডিশিয়ারিতেই ঢুকেছে। সে যখন শিয়ালদহ কোর্টে মুন্সেফ তখন কি খেয়াল হল ওর দপ্তর দেখতে গেলাম। আমার ভগ্নিপতি রমেশবাবু কোর্টে টাইপিস্ট-এর কাজ করেন (চাকরি নয়)। তাঁর কাছেই প্রথমে গেলাম, উনি বললেন—আরে সে তো সিভিল কোর্টে। আমাদের এটা পুলিস কোর্ট—

সেই প্রথম বাস্তব জ্ঞান হল সিভিল আর ক্রিমিন্যাল অর্থাৎ দেওয়ানী আর ফৌজদারী দুটো আলাদা আদালত। আমাকে দেখে ও খুব খুশি বিস্মিতও। যতক্ষণ ওর খাশ কামরায় বসে আড্ডা দিলাম জর্দা পান হাসি খুশি কিন্তু টিফিনের পর ঘরের বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড গাম্ভীর্যের সঙ্গে দোতলার মেঝেতে বুক-কাঁপানো ডার্বি-জুতোর খট্-খট্ আওয়াজ তুলে চলতে থাকল—এ যেন অন্য চরিত্র।

ওর ছোটকাকা নগেশচন্দ্র তখন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, ভবেশ ডোভার রোডে তাঁর সরকারী কোয়ার্টারেই থাকে। রবিবসরীয় আড্ডায়ও ঢাকুরিয়াতে আসে। ছোটকাকার বাড়ির সামনে পুলিস গার্ড পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই ফুলের গাছপালা আর সবুজ লনের পাশ দিয়ে খোলা বারান্দা—সেখানেও আমাদের আড্ডা জমে। মাঝে মাঝে ছোট কাকা খাশ বিক্রমপুরী ভাষায় দরাজ গলায় এক-একটা সাইড স্টোরি ছাড়েন। একবার তিনি রায় দেবার সময়ে পুলিসের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র বিরূপ মন্তব্য করার ফলে পুলিসের কর্তাব্যক্তিরা আরদালি পাল্টে দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে কপটতা কিছু নেই। তবে আগের আরদালিটি ছোটকাকার মোটর চালাতো আর নতুন যে বহাল হ'ল সে ড্রাইভিং জানে না। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটকে এইভাবে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেও কিছু লাভ হয়নি। ছোট কাকা বাঙালে গোঁ বজায় রেখে নিজের মতো বন্দোবস্ত করলেন।

আর একদিনের কথা, ছোটকাকা বাগানে নিরানি দিয়ে গাছপালার কাজ করছেন। ভবেশও করছিল আমি যেতে কাকার হুকুমে হাত ধুয়ে দালানে এল—একে একে তাঁর পুত্র শিবু, সন্তু এবং কন্যা মুক্তি সবাই এসে জুটল, বাপ্টি তখন ছোট। সন্তু সত্যেন পরে ঈশান স্কলার এবং প্ল্যানিং কমিশনের মেম্বার হয়েছে। এরা সবাই ছোটকাকার ছেলেমেয়ে। উঠানের অপর প্রান্ত থেকে নিরানি হাতে ছোটকাকার ভরাট গম্ভীর কন্ঠ ভেসে এল—আরে ও ভজু, রেডিওর লাইসেন্সটা রিনিউ করা হয়েছে?

মাথা চুলকে ভবেশ বলল—এখনো সময় আছে, লাস্ট ডেট তো ৩১ তারিখে!।

—হঃ লাস্ট ডেট ধইরা বইসা থাক! বাঙালীর এই একটা বৈশিষ্ট্য। জানস্ কাইল এক কান্ড হইছে। তগো এক মস্ত বিপ্লবী নেতা দরজা বন্দ দেইখ্যা জানলা লপ্টাইয়া আমার ঘরে ঢোক্‌ছে! হাতে দেখি নমিনেশন পেপার!

বললাম—এই ডা কী? আপনি না একজন মন্ত্রী!

আসলে ইলেকশানের নমিনেশন পেপার জমা দেবার শেষ সময় বেলা বারোটা পর্যন্ত। কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই মন্ত্রীর নাম চুপি চুপি বলেছিলেন, কেবল ভবেশকেই। আমরাও শুনে নিলাম তার কাছে চুপিচুপি!

উপসংহার হিসেবে নীরানি চালাতে চালাতে বললেন—যেই রাজ্যে মন্ত্রীর এই সময়জ্ঞান সেইখানে কারে দোষ দিমু?

এরপর ভজুকে বলতেই হ'ল—না, কালই দেবো।

ছোটকাকা আমাকেও একবার ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন। ভবেশ তখন মফঃস্বলের আদালতে বহাল, ছুটিছাটায় কলকাতায় এলে দেখা করে। একবার দোকানে দেখা না পেয়ে চিরকুট লিখে রেখে গেছে। নিউ আলিপুরে ছোটকাকা বাড়ি করেছেন, রিটায়ার করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন। গিয়ে শুনলাম ভজুওরা কেউ বাড়ি নাই। আমার কাছেই বসো। গল্প করা যাক।

একথা-ওকথার পর হঠাৎ হাসলেন তিনি—আচ্ছা তুমি তো সাহিত্যিক! একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

—কি?

—পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ভালো, না, পূর্ববঙ্গের?

সহজ জবাব—আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের আর আপনার কাছে নিশ্চয়—

কথাটা শেষ করতে দিলেন না—না না, আমি সেন্টিমেন্টাল উত্তর চাই না। যুক্তি দিয়া বুঝাও—পশ্চিমবঙ্গের ভাষা কি জন্য ভাল।

—এটা তো ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার!

—উঁহুঁ। পূর্ববঙ্গের ভাষাই ভাল। ক্যান্—শোন! ধর তোমার হাতে একটা পান আছে, পান দেখে আমার খেতে ইচ্ছা হল। পশ্চিমবঙ্গের লোক হলে বলবে, 'আপনি কি পানটা খাবেন? যদি না খান, আমাকে দিলে আমি খেতে পারি।' আর আমরা বলব, 'পানডা না খান ত দ্যান আমি খামু!' আসলে ভাব প্রকাশে directness-ই এ ভাষার বড় গুণ। জান কাল সার্ভিস কমিশনে ভাইভাভোসিতে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। একটা জবাবও পছন্দ হয় নাই।

ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে মনে হল উনি তো ঠিকই বলছেন। কিন্তু একটু চিন্তা ক'রে দেখলাম ওঁর যুক্তি সব জায়গায় খাটে না। বললাম—আমাকে সাহিত্যিক বলে প্রশ্নটা করেছেন আপনি। ভাষার কাজ তো শুধু বক্তব্য জানানোই নয়, সুন্দর ভাবে প্রকাশও ভাষার গুণ। সেই পুরনো দুটি নমুনা দেখাতে পারি। একজন বললেন, 'শুষ্কং

কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে' আর একজন একই কথা বললেন অন্য ভাষায় 'নীরস তরুবর পূরতো ভাতি।' ছোটকাকা আমার মনে হয় পূব-পশ্চিম বলে ভাষাকে আঞ্চলিক ভাবে চিহ্নিত ক'রে ভাষার যোগ্যতা বিচার করা চলে না।

কোনো জবাব না দিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে পানের ডিবেটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

ভবেশের একটি ফোটো তুলেছিলাম। এনলার্জারে ফিল্ম চড়িয়ে দেখি ছবিটার সবই নিখুঁত, ব্যক্তি চরিত্রের বিশেষ মুডটিও চমৎকার এসেছে কিন্তু মাথার ওপর দিকে চুলের কিছুঅংশ কাটা পড়েছে। লেন্সের বাইরে কি করে গেল? এই নিয়ে মন খুঁত খুঁত করল কিন্তু ছবিটার মধ্যে কি যেন অ্যাপিল আছে, এনলার্জ করে ভাবলাম এটা আর ভবেশকে দেবো না, নিজেই রেখে দেবো।

কিন্তু ছবিটি দেখি ভবেশের খুব পছন্দ হয়ে গেল। বলল—আমার মাথাটা কেটেছিস। তা হোক, তবু নিলাম।

হাসতে হাসতে আমি নাকি জবাব দিয়েছিলাম—তোর মাথাই নেই তার উঠবে কি? Photo cannot lie.

দিন কয়েক আগে যোধপুর পার্কে ভবেশের বাসায় গিয়েছিলাম। বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করার পর হাইকোর্টের বিচারপতি পদ থেকে হালে অবসর গ্রহণ করেছে। সেই পুরনো ছবিটা এখনো অ্যালবামে আছে, দেখিয়ে সে-ই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

নিজেদের অগোচরেই মোতিমহলের ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল। এই বাড়িটার পিছনে অনেক অর্থব্যয় করেছি, কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বানানোর চেষ্টায়। ডোবার পাশ থেকে বাড়ির পশ্চাৎ ভাগে বেড়া দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু চারাগাছ এনে লাগিয়েছে আমার ভাগ্নে ডুডুম। সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, দেশে বাপের জমিজিরেত আছে, চাষের দিকে ঝোঁকও আছে তার। বাজার-হাটের ঝামেলা এখন আমাকে পোহাতে হয় না। একতলার একখানা ঘরে সে থাকে, তার ওপর ভরসা করে 'আইডিয়াল অয়েল মিলে'র মালিক বালিগঞ্জে বইএর দোকান খুললেন—অবশ্য মূলতঃ আমারই উৎসাহ ও উদ্যোগ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। তেলের পয়সার সঙ্গে কিছু কালচারাল সুনাম থাকা মন্দ নয়—বোধহয় এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ভাগ্নের একটা হিল্লে হ'লে কোন্ মামা খুশি না হয়!

দোকান ফেরত সন্ধ্যের পর বাড়ি ঢুকে সিঁড়ির নীচে দেখি একতলায় সুরূপা রান্না করছে। আমাকে দেখে ও বলল—মোতিবাবু এসেছেন।

—কই?

—এতক্ষণ তো এখানেই জ্বালাতন করছিলেন। একবার বলেন মা জননী তোমার কাছে চা খাবো। আবার বলেন তোমরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে মোটা টাকায় ভাড়া দেবো। কিছুতেই নড়ে না বুড়ো। মনে হয় তোমার গলা পেয়ে, সুরেনের কি অভয়ের ঘরে ভাড়ার তাগাদার নাম ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে।

মেজাজ বিগড়ে গেল। বললাম—ছাদের চালা উড়ে গিয়েছে সে কথা বলেছ?

—হ্যাঁ। উনি জিগেস করলেন, এখানে রান্না করছেন কেন মা? তখনই বলেছি আর তারপরই বললেন, তোমরা উঠে গেলেই পার! কে থাকতে বলেছে।

কালবৈশাখীর ঝড় ফি বছর আমার ওপর দিয়েই যায়—চিলেকোঠা-কাম-রান্নাঘরের চালা উড়ে যাবেই এবং ঘরামি ডেকে মেরামত ইত্যাদি বাবদ বাঁধা খরচ আমার আছেই। চালা উড়ে যাওয়ার পর মোতিবাবুকে পেয়েছি এই প্রথম। দোতলায় ডেকে চা-বিস্কুট দিয়ে নিবেদন করলাম—আপনি অন্ততঃ একবার ছাদটা সারানোর ব্যবস্থা করুন।

তুবড়ি ফাটা আওয়াজ হ'ল—ছাদ তো ভাড়া দেওয়া হয়নি! তা ছাড়া নীচের জমি জবরদখল ক'রে বেড়া দিয়েছেন, আমি বেড়া ভেঙে দেবো।

—বেড়ার কথা পরে হবে। আগে ছাদের চালা বসানোর ব্যবস্থা করুন। সেদিন চালা উড়ে গেল। তারপর শুরু হ'ল তুমুল বৃষ্টি। সিঁড়ি দিয়ে তোড়ে জল নেমে দোতলা ভেসে গেল। এ ভাবে মানুষ বাস করতে পারে?

তিনি বাদশাহী মেজাজে জবাব দিলেন—বৃষ্টি হ'লে জল সিঁড়ি দিয়ে নামবেই। মশাই আপনি তো ঘরেরই ভাড়া দেন, আর সব জায়গার কথা উঠছে কেন?

এরপর আর সামলাতে পারলাম না—যে সিঁড়ি দিয়ে জল নেমে যায়, আপনিও সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

—অ্যাঁ! তুমি আমার বাড়ি থেকে বার ক'রে দেবে আমাকে?

—তুমি নয়, আপনি! ভাড়া দিয়ে যতকাল থাকব ততকাল আমার। দিল্লির মেজাজ এখানে ফলাতে আসবেন না।

দু-চার দফা গরম-গরম কথার পর খুব ঠান্ডা গলায় বললাম—এমনি যাবেন, না, গলা ধাক্কা দিতে হবে?

মোতিবাবু নীচের উঠোনে কিছুক্ষণ ছুঁচোবাজির মতো ছুটোছুটি করেন। সুরেন, সুশীলার মা, অভয়, ক্ষুদের মা, বীণার মা বস্তির সবাই—টিনের চালার বাইরে জমেছে। শেষ পর্যন্ত আর কিছু না পেয়ে মোতিবাবু বাগানের বেড়া নিয়ে টানাটানি শুরু করলেন। ওপর থেকে হুঙ্কার দিলাম—খবরদার! বেড়া ভাঙলে খোঁয়াড়ে পুরে দেবো! সিধে বাড়ি যান। ছেলেদের কাউকে রসিদ লিখে পাঠিয়ে দেবেন, তাদের হাতে ভাড়া দেবো। আপনাকে দেবো না। দেরি করবেন না—যান!

মোতিবাবু চিৎকার করতে লাগলেন—আমাকে মেরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিয়েছ, আমিও দেখে নেবো! এই, তোমরা সবাই দেখেছ—হ্যাঁ!

দিনদুই পরে মোতিবাবুর ছোট ছেলে এসে ভাড়া নিয়ে গেল। এরপর সুরেনকে ডেকে নতুন অ্যাজবেস্টস আনিয়ে চালা তোলাচ্ছি। থাকতে গেলে এ ছাড়া উপায় কি? সে এক ফাঁকে বিড়ি টানতে টানতে বলল—গৌরীবাবু, মোতিবাবুর বাড়িতো মেরামত করাচ্ছেন আর উদিকে আপনার নামে মামলা ঠুকছে ওই সমুন্দি, সে খবর রাখেন?

কথাটা বিশ্বাস করিনি কিন্তু সুরেন যখন বলল—আমাকে ডেকেছিল সাক্ষীর জন্যি। বলচি বেইমানী করতে পারব নি। কিন্তু সাক্ষী দেবে আমার পাশের ঘরের লোক।

সত্যিই সমন এল। তাতেই আমার মাথা ঘুরতে লাগল। দোকানে মুখ শুকিয়ে বসে আছি। প্রফুল্ল গুহ এসে খোশ গল্প জুড়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ভাববৈষম্য দেখে জেরা শুরু করলেন। আমার যেন জেল হবেই এমন বিশ্বাস দেখে আর একপত্তন অট্টহাসি তোড়ে ভাসিয়ে দিলেন—আরে মশাই সায়লকার মাঠ নিয়ে লাঠি, বোমা, গুলী কতো দেখলাম। আমাদের এখন এর মধ্যেই বাঁচতে হবে, মশাই। লড়াইকে ভয় করলে চলে? সমনে যে-সব ধারা দেখচি তাতে বড় জোর কিছু জরিমানা হতে পারে।

অবশেষে দু'জনে মিলে শিয়ালদ কোর্টে গেলাম, রমেশবাবু পিনাল কোড দেখে বললেন—তোমার ভাবনার কিছু নেই। পঞ্চাশ টাকা—তাও দোষী সাব্যস্ত হলে। এই কোর্টে হ'লে আমিই সামলে দিতাম কিন্তু ঢাকুরিয়া যে আলিপুরের জুরিস্‌ডিকশন! দ্যাখোই না।

ভূপেনের এক সময়ের সহকর্মী গুণেন ভটাচায আইন পাস করেছেন এবং আলিপুরেই প্র্যাকটিস করেন, কফি হাউসে প্রায়ই আমার টেবিলে আসেন। তিনি বললেন—আমি থাকতে এ কেস কারুর হাতে দেব না।

এত সমর্থন ও অভয়বাণী সত্ত্বেও মামলার তারিখে নার্ভাস হয়েছিলাম। সঙ্গে ত্রিদিব ঘোষ ছিলেন। আমাদের কেস উঠতেই গুণেনবাবু লম্বা লেকচার দিয়ে আসামী যে কতদূর সম্ভ্রান্ত এবং পবিত্রচেতা লোক বোঝাতে চাইলেন। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে আদালতে আসার সময় পাওয়া মুস্কিল। অবশেষে এক্ষেত্রে আসামীর হাজিরা মকুব করার আদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। ফরিয়াদি

পক্ষের উকিলও পাল্টা জবাবে বললেন মুদিখানার মালিক আর বইএর দোকানদারে কোনো পার্থক্য নেই, কেরানীও নিজেকে সাহিত্যিক বলে দাবি করতে পারে! অতএব হুজুর যেকোন ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল এগজেম্‌শন অব পার্শোনাল অ্যাপিয়ারেন্স চাইলেই, রেসপেক্টেবল বলে তা মঞ্জুর করা চলে না। দুই উকিলের বাকবিতণ্ডার মধ্যে হাকিম প্রশ্ন করলেন—বাট আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইজ হি নট প্রেজেন্ট টু-ডে?

গুণেনবাবু কিছু বলার আগেই আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—আমি হাজির আছি ইওর অনার!

হাকিম আমাকে চোখ বুলিয়ে শাসালেন বোধহয় এবং তাঁর কণ্ঠে কিছু বিস্ময় ফুটল এটা অবিশ্যি আমার ধারণা।—'ও আপনি! ঠিক আছে বসুন।'

মোতিবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হল। সাক্ষীসাবুদ তলব না ক'রেই সেদিন অন্য মামলার ডাক হল। আমাকে হাজিরা থেকে রেহাই দেওয়া হ'ল।

এরপর গুণেনবাবু একাই আদালতে গিয়েছিলেন পরের তারিখে। বিকেলে দোকান থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে সগৌরবে কফি হাউসে বোঝালেন, কেস ডিস্‌মিস হয়ে গেছে। আর মশাই চার্জই ফ্রেম করতে চায় নি হাকিম। আমাদের এবারে হাইকোর্টে এক নম্বর ঠুকতে হবে; মানহানির দায়ে ব্যাটাকে—

আমি ওর মধ্যে নেই। কোর্টে গেলে মনেই হয় না যে, দুনিয়াতে আর কোনো কাজ থাকতে পারে। মনে হয় সময়ের দাম নেই, মান ইজ্জত পয়সা দিয়ে মাপা হয় আর বাতাসেই যেন চক্রান্তের ব্যাকটেরিয়া ছড়ানো। দুঁদে উকিল লাগাতে পারলে হয় কে নয় করা যায়।

গুণেন ভটচার্য মশাই নেহাত নাচার ভাবে হাত উল্টোলেন—তবে আর কি হবে। দশ হাজার টাকার দাবিতে মানহানির মামলা স্বচ্ছন্দেই করা যেত। পরে গুণেনবাবু দিল্লি চলে যান এবং লোকপরম্পরায় শুনেছি শেষে দিল্লি স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের সেক্রেটারি হয়েছিলেন।

বাড়িওয়ালা মামলা করতেই আমি হার-জিতের কথা না ভেবে এই বাড়িটি ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং সেলুন-ওয়ালা সয়ারাম শর্মা, আমার বেতনভুক মিত্রঘোষ তথা মিত্রালয়ের বেয়ারা শান্ত থেকে শুরু ক'রে তা বড় ব্যক্তিদের অনেককেই বাড়ি খুঁজে দেবার অনুরোধ করেছি। মোতিবাবু হেরে যাবার পরও সে মনোভাব বদল হয়নি। এটা তো ঠিক যে, দুর্জন সংসর্গ বর্জন করতে পারলে শান্তিতে থাকা যায়। বিশেষ করে মোতিবাবুর পক্ষে বস্তির যে অভয় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিতে গিয়েছিল তার মত লোকের মুখ এবেলা ওবেলা দেখতে হচ্ছে। অন্যের উস্কানী পেয়ে আমাদের অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়ে বা সুরূপাকে সে বিপদে ফেলতে পারে। বেইমানদের বিশ্বাস নেই। ওই অভয়ের ছেলে খুদে বা খুদের মাকে কত বার ওষুধ-পত্র দিয়ে রোগমুক্ত করেছি আমরা। তা ছাড়া সুরূপা বাচ্চাদের ইজের-জামা ইত্যাদি মাঝে মধ্যেই দিয়ে থাকে। অভাবী মানুষই বা তাকে কি ক'রে বলি—সে ঘরামীর কাজ করে না, গড়িয়ার হাট থেকে আনাজপাতি এনে গড়িয়াহাট বাজারে বিক্রি করে। ঢাকুরিয়ার বাজারে এর চেয়ে কম দামে পেতে পারি জেনেও অনেক সময় আমরা তার খদ্দের হই। অভয়কেই ভয় করতে হয় এযুগে। এরকম আরও অনেক নাম আমার জানা আছে তার মধ্যে আত্মজ সত্যশংকরও ধর্তব্য, আমার সহপাঠী চরণদাসের বড়দাদা ধর্মদাস নিজেদের কর্মচারীদের সামনেই পিতাকে প্রহার করেছে—এও দেখেছি। পিতার অপরাধ মিছরি খাবার শখ হয়েছিল তাই তিনি ছেলের কাছে আট আনা পয়সা চেয়েছিলেন। সেই পরিবারের ভেতরের কথা না জানলেও নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ি, কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গে বিরাট বাড়ি, ছাপাখানা, বইএর বিরাট কারবার তো ছেলেবেলায় দেখেছি। আইন পাসকরা ছেলে কেমন কায়দা ক'রে ফোঁটা তিলক কাটা যুগলদাসকে ফাঁকি দিয়ে সে ব্যবসা দখল করেছে সে রহস্য অজ্ঞাত।

নামমাহাত্ম্য থাক। মোতিমহলের মোহমুদগর হিসেবেই বোধহয় ভাগ্যবিধাতা ভৃগেন্দ্রনাথকে দিল্লি থেকে কলকাতায় দৌত্য করতে পাঠালেন। দেবদাস গান্ধীর কাগজের চাকরি ছেড়ে সে অন্য সংবাদপত্রে কাজ করছিল, সে চাকরিও ছেড়ে ইউ.এস.আই.এস.-এর চাকরিতে বহাল হ'ল। মোটা মাইনে, উঁচু পদ অথচ মোতিমহলে বোনটির কাছেই থাকতে হয়। বোনটিকে সে হামেশাই খোঁচায়—'গৌরীটাকে কিছুতেই মানুষ করা গেল না। ওর যা ইন্‌কাম তাতে অন্য লোকে বাড়ি করে ফেলত। আরে, নিদেন ভদ্দরলোকের মত একটা ফ্ল্যাটে তো থাকতে পারিস!' অথচ এই ভৃপেনই আমাদের যখন এ বাড়িতে এনেছিল তখন হাল কত খারাপ ছিল। অবিশ্যি তখন সংসার ছোটই ছিল।

বাড়ি ছাড়ার ব্যাপার বাদেও কিছু কিছু সমস্যায় ওই সময়ে বিব্রত ছিলাম। তার মধ্যে খুকু অর্থাৎ বমা একটি। সবাইকে আপন বলে ভাবার ধর্মই বোধহয় অপরের সমস্যাকে নিজের স্কন্ধে নেওয়া—সচেতন বা অবচেতনে!

এক এক সময়ে নিজেরই সন্দেহ হয় বুঝি বা মেয়েটির উচ্চতর শিক্ষার পরোক্ষ সহায়ক হতে গিয়ে অন্তরায় হয়ে পড়ছি। এটা দায়িত্বশীলতা নয়। ওদিকে খুকুর মা ওর জন্যে পাত্র দেখার কথা মাঝে মাঝেই বলেন। আমার বাড়ি বদলের চেয়ে ওকে পাত্রস্থ করার ভাবনাই বেশি। দাদাকে বললাম সে কথা। তিনি তাঁর জানাশোনা যে ভাল পাত্রের খোঁজ দিলেন, তাঁকে আমিও চিনি। দেখতে শুনতে ভাল, ছ ফুটের ওপর হাইট এবং খুব মজা ক'রে কথা বলেন সেই মোহনদা। দাদার বন্ধু সেই সুবাদেই মোহনদা, বয়সে আমারই সমান। খুকুর দাদা রাজীবকে নিয়ে এক শীতের রাতে বার্ণপুরে দাদার 'K' টাইপ কোয়ার্টারের বেআইনি টিনের চালায় রাত কাটালাম—দাদাও পাশের ক্যাম্পখাটে। কোম্পানির বরাদ্দ আসল এক এবং অদ্বিতিয় দশ-বাই-দশ ফুট ঘরে তিন ভাইপোকে নিয়ে দিদি থাকেন, থাকেন সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র। বৌদির আকস্মিক মৃত্যুর পর আমাদের এই পিসতুতো দিদিকে কতকটা জোর করে কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ির চাকরি ছাড়িয়ে আঁতুরের ছেলের ভার চাপিয়ে দিয়েছি আমরা।

রাজীব সবে সাবালক হয়েছে। তার ভরসা আমি এবং আমার ভরসা দাদা। শেষ পর্যন্ত পাকা কথা হয়ে গেল। আদাকার গার্ডেনে মোহনদের পৈতৃক বাড়ি। এবং সে নিজে লোকো-ফোরম্যান। খুকুর বিয়ে স্থির হওয়াতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, ও কতকটা টিপ-সই দেবার মত মেনে নিল অর্থাৎ আর সব ব্যাপারের মত এক্ষেত্রেও আমার সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণ করল।

গভীর রাতের সমস্যা। শীত বেশ চেপেই পড়েছে। সকালের চেয়ে লেখার সময় এখন রাতেই, বিশেষতঃ ভৃপেন দিন কয়েকের জন্য দিল্লি যাওয়ায় সান্ধ্য আড্ডা নেই। চোখের পাতা ঘুমের ভারে বুজে আসতে চাটিবাটি গুটিয়ে আলো নিভিয়ে মুহূর্তে গভীর অন্ধকার সমুদ্রের তলায় অচেতন বালুকণার মত লুপ্ত হয়েছি।

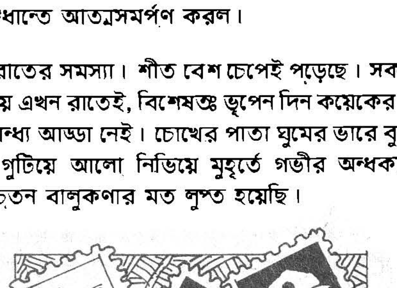

লালবাড়ির রহস্য

মাঝারি মাপের ক্রিমিনালরা বাগে আসছে না কেন ?

বামরাজত্বে বড়মাপের ক্রিমিনালদের চাইতে মাঝারি মাপের ক্রিমিনালরা লালবাজারের গোয়েন্দাবাড়ির ফেলুদাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ব্যাংকডাকাতরা এখন কাবু হয়ে পড়লেও ছিনতাইবাজ, পকেটমার, ফ্ল্যাট ডাকাত ও পেট্রোল পাম্পের ডাকাতরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ব্যাংকডাকাতদের প্রায় ছয়টি দল ও উপদল যারা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ডাকাতি করে পরের ধন হাতিয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেছিল তারা এখন জেলে ঘানি টানছে। এক সময় এরাও গোয়েন্দাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিল।

কিন্তু এরা ধরা পড়লেও অনুরূপ জাতের মাঝারি মাপের ক্রিমিনালরা গোয়েন্দাদের বড়ই বেগ দিচ্ছে। হররোজ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় দুই গন্ডা করে ছিনতাই, দুই ডজন করে পকেট কাটা যাচ্ছে। প্রতিদিনই একটা না একটা ট্যাক্সি ছিনতাই হচ্ছে। পথেঘাটে এমন কি বাসেও ক্ষুর চালাচালি লেগে রয়েছে। সোনাদানা পরে পথেঘাটে বার হওয়াই এখন দায়। ময়দান এলাকায়, গংগার আশেপাশে রোজই ছিনতাই লেগে রয়েছে। ঘাইবাজ পকেটমাররা আবার বাসে ট্রামে গেরিলা কায়দায় গাঁট কাটতে শুরু করেছে। অথচ গোয়েন্দা পুলিস তাদের ধরতে পারছে না। অন্ধকার জগতের এইসব খারাপ লোককে পুলিস ধরতে পারছে না কেন ? আসলে কলকাতা পুলিসের ইনটেলিজেন্স ব্যর্থ হয়েছে। এখন কলকাতা গোয়েন্দা পুলিসের চরদের নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়েছে। চররা কথা বলছে না। ওরা আর গোপন খবর দিচ্ছে না। পুলিস চরদের কাছ থেকেই আগাম খবর পায়। অন্ধকার জগতের খবরাখবর পুলিস-চররাই পুলিসদের দেয়। এ ছাড়া অন্যকোন উৎস নেই। সেইজন্য গোয়েন্দা পুলিসকে চরচক্র তৈরি করতে হয়। যাঁর যত সোর্স আছে তিনি তত বড় গোয়েন্দা অফিসার। এদের ভালমন্দের দেখভাল করতে হয়। বিপদে পড়লে চরদের আশ্রয় দিতে হয় গোয়েন্দাদের। নিয়মিত এদের সংগে গোয়েন্দাদের যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। পোড়খাওয়া গোয়েন্দারা রীতিমত এবং নিয়মিত চরদের সংগে মেলামেশা করেন। সোর্স কালচার না করলে চররা মুখ খোলে না। তবে এ সম্পর্কে গোয়েন্দাদের মুশকিলেও পড়তে হয়। বছর তিন আগে ডাকাতদের সংগে যোগসাজসের অভিযোগ উঠেছিল একজন গোয়েন্দা অফিসারের বিরুদ্ধে। তখনকার পুলিস কমিশনার নিরুপম সোম এই অভিযোগ এনেছিলেন। তদন্তও হয়। কিন্তু তা আজও প্রমাণিত হয় নি। নিরুপম বাবু এখন হোমগার্ডে, আর সেই অফিসার এখন বছর দুয়েক ঘানি টানার পর আবার চলে এসেছেন থানায়।

এ ঘটনার পর গোয়েন্দারা অন্ধকার জগতের চরদের সংগে খুব বুঝেশুনে মেলামেশা করছেন। গোয়েন্দারা প্রায় বলেন, দেখুন অবস্থা খারাপ। এখন যে কোন সময় যে কোন অফিসার তাঁর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারেন। শুধু একজন ব্যাংক ডাকাতের কণ্ঠস্বর টেপ করে নিতে হবে। ডাকাতকে দিয়ে শুধু বলাতে হবে, অমুক অফিসার আমার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন। আমার বাড়িতে বসে মিষ্টি খেয়েছেন। ব্যাস তাহলেই হল

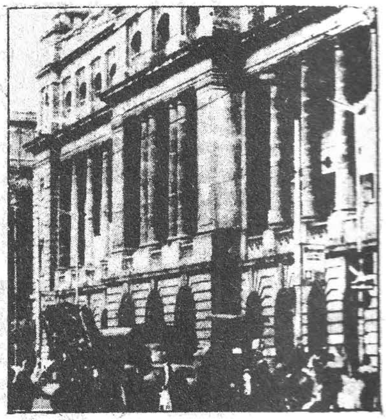

তবে বিকাশকলি বসু তাঁর আগের কমিশনার নিরুপম সোমের মত বায়ুগ্রস্ত নন। নিরুপমবাবু নিজে সৎ ছিলেন। অপরকে দায়িত্ব দিয়ে রাতে তাঁর ঘুম হত না। তাঁকে ইডেনের দরজায় টিকিট পরীক্ষা করতেও দেখা গেছে। তবে বিকাশকলি বাবুর এ ধরণের ছুৎমার্গ নেই। সবার উপর দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে থাকেন। বিকাশবাবু মনে করেন ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে চর দরকার। তাই কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি গোয়েন্দাদের সংগে বৈঠকে আরও নতুন নতুন চর তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু গোয়েন্দারা সবাই এদিকে নজর দিচ্ছে কোথায় ? একমাত্র ডাকাতি তদন্ত শাখা ছাড়া গোয়েন্দা পুলিসের আর সব বাহিনীর অফিসাররা সোর্স-নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সময় দিচ্ছেন কোথায় ? কলকাতা পুলিসের নাম রেখেছে এই ডাকাতি তদন্ত শাখা। অনেকেই মনে করেন ইনস্পেক্টর রুণু গুহনিয়োগী এবং তাঁর অফিসারদের তৎপরতায় ব্যাংক ডাকাতি কমেছে। আপাতত বন্ধ। আর এই কারণেই লালবাজারের কর্তাব্যক্তিদের চাকরির দফা রফা হয়নি। এদের নাম ভাঁড়িয়ে অনেক তাবড় অফিসার আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। অথচ একদিন বামফ্রন্ট সরকার এদের অপদস্থ করতে চেয়েছিল। এখন কিন্তু এঁরাই বামরাজত্বে বামফ্রন্টের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন অফিসার হয়েছেন। অবশ্য এঁরা নিজেদের দক্ষতার নিরিখে লালবাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আসলে পুলিসে এখন চলছে খেয়োখেয়ি। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে চলছে মামলা আর মামলা। পদোন্নতি নিয়ে মামলা চলছে কনেস্টবল থেকে প্রমোশন পাওয়া এস আই এবং সরাসরি এস আইদের মধ্যে, রাজ্য পুলিস সার্ভিস থেকে উন্নীত হওয়া আই পি এস এবং সরাসরি আই পি এস অফিসারদের মধ্যে। কর্তারা যে যার চেয়ার নিয়ে ব্যস্ত। নিচের অফিসাররা প্রমোশন না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। এক একজন এস আই একই পদে ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে রয়েছেন। অথচ ইন্‌সপেক্টর যে কবে হবেন তা ওঁরা কেউ জানেন না। অথচ সার্জেন্টরা বিদ্যাবুদ্ধিতে এস আইদের চাইতে খাটো হয়েও প্রমোশন পেয়ে গেলেন। সম্প্রতি ৭২ জন সার্জেন্ট এবং ইন্‌সপেক্টর প্রমোশন পেয়েছেন। এরা সাধারণ শাখার। এদের তদন্ত করবার ক্ষমতা নেই। গোয়েন্দা বিভাগে এই সেদিন মাত্র দশজন এস আই-এর প্রমোশন হল। অর্থাৎ যাঁরা আইন শৃংখলার দেখভাল এবং অপরাধের তদন্ত করেন সেই সাব-ইনসপেকটররা কিন্তু যে তিমিরে ছিলেন এখনও সেই তিমিরেই আছেন। এদের মনোবল ভেঙে গেছে। কলকাতা পুলিসের তুলনায় জেলা পুলিসে প্রমোসনের সুযোগসুবিধা আরও বেশি। এমনও দেখা গেছে জেলা পুলিসের একজন এস আই ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে ডি এস পি হয়েছেন কিন্তু ঐ একই ব্যাচের এস আই কলকাতা পুলিসে এখনও ইনসপেক্টর পদে স্থায়ী হতে পারেন নি। এ সি হবার স্বপ্ন ওঁরা দেখেন না। পদোন্নতির সুযোগসুবিধা না বাড়লে পুলিসের নিচের মহলের কর্মদক্ষতা বাড়বে না। যেখানে শুধুমাত্র গ্রাজুয়েট হলেই চলে সেখানে আইনের স্নাতক এবং এম এ পাশ ভূরি ভূরি আসছেন। এঁদের হতাশা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে পুলিস প্রশাসন চাংগা হবে না। □

কমল

অযথা

অশোককুমার সেনগুপ্ত

গল্প

১

শৈবালের অফিস থেকে ফেরার পথে প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু কাজ থাকে। বৌদিদের কিছু জিনিস কেনা কিংবা কোন নাটক দেখতে যাওয়া কিংবা রিহার্সাল কিংবা-। শৈবাল অভিনয় করে। অফিস থিয়েটারে তার মুখ্য ভূমিকা। পরিচালক নাট্যকার কল্যাণ গুহ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারি। সে শৈবালের অভিনয় নৈপুণ্যকে মর্যাদা দেয়। তাদের বন্ধুত্বও গাঢ়।

একজন মাঝারি ধরণের হিন্দী ছবির নায়কের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে। এই মিলটা তার ক্ষতি করেছে। স্বতন্ত্রতা গড়ে উঠতে দেয়নি। চুলের ছাঁট, কপাল, চিবুক, নাক, কান থেকে অভিব্যক্তির মধ্যেও ওই মিলের ছায়াপাত ঘটে। কল্যাণ বলে, 'চন্দ্রকুমারের ড্যামি হয়ে বোম্বে যাবি ?'

শৈবালের শ্যামোজ্জ্বল রঙ। ভারী মাথা ভর্তি চুল, মোটা খাড়া নাক। মানানসই প্যান্ট শার্টে একটা দৃপ্ত দীর্ঘপুরুষ।

শৈবালের দু'দাদা রয়েছেন। এক বোন। গত বৈশাখে বিয়ে হয়ে গেল। বাবা ওকালতি করতেন। বড়দা বাবার বৃত্তি নিয়েছেন। মেজদার ব্যবসা। ছোটখাট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। পৈতৃক দোতলা বাড়ি। মা বেঁচে আছেন। বড়দার দু' ছেলে। মেজদার একটা মেয়ে। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিষকীট এখনও এ পরিবারে বাসা বাঁধেনি। দু' বৌদির সঙ্গে সম্পর্কে শৈবালের মধুরতা আছে। অভিনেতা দেওর তাদের অহংকার। বিয়ের জন্যে চাপ দেয় তারা। কিন্তু শৈবালের তরফে বিষয়টা মজার। মোটেই সে সীরিয়াস নয়। তবে এতদিন পর্যন্ত বোন সুদীপা ছিল। ওর বিয়ের পর দু' বৌদিই চাপটা বাড়িয়েছেন। বাড়িতে দুটো ছবি এবং তিনটি প্রস্তাব এসেছে।

শৈবালের অফিস থেকে আজ সকাল সকাল ফেরার কথা। বড়বৌদিকে তার বাপের বাড়ি বালীতে পৌঁছে দিতে হবে। সেজেগুজে বড়বৌ বসে আছে। দেওরটির উপর অগাধ বিশ্বাস বড় বৌয়ের। শৈবালের না ফেরাটা তাকে ব্যস্ত করে সব থেকে বেশী। বারান্দা ঘর পায়চারি করে ব্যগ্র পায়ে। উত্তরের জানলা দিয়ে গলির রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। বারবার পা জোড়া এগিয়ে যাচ্ছে। একা যেতে পারে বৌরা। কিন্তু সে কথা ভাবে না। বস্তুত শৈবালের কথা রাখাটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আজকের ব্যতিক্রমে তাই উদ্বিগ্নতা ঘিরে ধরে। ভাবে, শহর জীবনে ঠিকঠাক কিছুই বজায় রাখা যায় না। বিশেষ করে সময় ব্যবহারের পরিকল্প বানচাল করে দেবার জন্যে যানজট যখন রয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনা যদি কিছু হয়। বড়বৌয়ের সারামুখ উদ্বেগ জড়তায় ভরে যায়। কি যে করে এখন। উত্তরের জানলা দিয়ে উদ্গ্রীব চাউনি ফেলে রাখে।

সরু গলি ধরে অজয়কে আসতে দেখা যায়। শৈবালের বন্ধু। পাড়ারই ছেলে। অজয়ের অফিস কোথায় জানে না। তা ডালহৌসিপাড়া এসপ্ল্যানেড হবে বৈকি। ভাবতে ভাবতে দ্রুত পায়ে নেমে এসে দরজা

খোলে বড়বৌ। অজয় ততক্ষণে দরজার সামনে।

'বৌদি, কোথাও বেরুচ্ছেন বুঝি!'

'বেরুনরই তো কথা! ঠাকুরপোর পাঁচটায় আসবার কথা। ছ'টা বাজল। ট্র্যাফিক জ্যাম নাকি?'

'শৈবালকে তো দেখলাম পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে। তখন সওয়া পাঁচটা'

'তাই নাকি?'

বড়বৌয়ের ঈষৎ থ্যাবড়ানো বড় মুখ। ছোট চোখ। বয়সের তুলনায় ভার শরীরে বেশি পড়েছে। মেদ নষ্ট করেছে দেহরেখা। মুখশ্রী। সিঁথির দু'দিকে বেশ কিছু সাদা রেখা টানা।

'আমি বাসে ছিলাম। কথা বলিনি।' তবে শৈবালই ছিল। অজয় দাঁড়াল না।

বাইরে দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে মেজোর কাছে গিয়ে বড়বৌ চাপা স্বরে বলল, 'ঠাকুরপো একটা মেয়ের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। অজয় ঠাকুরপো বলল।'

'তুমি বিশ্বাস কর না। আমি বলেছি না, ঠাকুরপোর নিশ্চয় মেয়ে আছে।'

'ও কি আমাকে নিয়ে যাবার কথা ভুলে গেল?' অভিমানে ভারী হল বড়বৌয়ের স্বর।

মেজবৌয়ের মুখে রহস্য কৌতুকের একটা হাসির কিরণ ছড়িয়ে পড়ল, 'প্রেমে পড়লে কারও কি কান্ডজ্ঞান থাকে দিদি?'

২

নাট্যকার পরিচালক কল্যাণ গুহ একটা নাটকের গন্ধ পায়। শৈবাল যে জয়তীর সঙ্গে প্রেম করবে, এটা তার মাথাতে আসে নি। আবার তার কাছে যে গোপন করবে সেটাও কি কম অবিশ্বাস্য! আজ সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের এসপ্ল্যানেড ইস্ট অফিসের সামনে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা তার সঙ্গে দেখতে যাবার কথা। বড়বৌদিকে বালীতে নিয়ে যেতে হবে বলে, বলল, তার যাওয়া হবে না। আর ও কি না পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে জয়তীর সঙ্গে গল্প করছে। পরিষ্কার আগে থাকতেই এই সাক্ষাৎকারটা নির্দিষ্ট হয়েছিল। ভাগ্যিস সে অফিস থেকে ভবানীপুরে অনুপমের কাছে একবার গিয়েছিল, একবার ইচ্ছে হয়েছিল বাস থেকে নেমে শৈবাল জয়তীর কাছে দাঁড়ায়।

কল্যাণ আগের নাটক 'এক জোড়া মুরগী'র জন্যে জয়তীকে নির্বাচন করে। এ নির্বাচন জয়তীর দারুণ অভিনয় নৈপুণ্য কিংবা রূপের প্রতি অনুরাগবশত নয়। আসলে জয়তীর দারিদ্র্যই এর কারণ। মোটামুটি অভিনয় করতে পারে। দেখিয়ে শুনিয়ে নিলে উতরে যাবে। ওর বাবার বুড়ো বয়সে কারখানায় লক আউট হয়েছে। দু'টো টিউশনি সম্বল। পরপর চার বোন। ছোট দু'ভাই স্কুল পড়ুয়া। বেহালার এক ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল পি এন্ড টির পরিতোষ। বলেছিল, কল্যাণবাবু পারেন তো জয়তীকে নেবেন। গ্রাম্যবধূর কোন রোল থাকলে ওর কথা একটু ভাববেন। জয়তী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্যামলা রঙের আয়ত চোখ জোড়ায় তারও সানুনয় প্রার্থনা অবশ্যই ছিল। ছিপছিপে চেহারা। ছাপা সাধারণ শাড়ি ব্লাউস। মুখে চোখে এক সবুজ স্নিগ্ধতা আছে পরবর্তী নাটকের পটভূমি গ্রাম। রোলটা মানাবে তখনই তার মনে হয়। ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলে। তারপর রিহার্সেল মেলামেশির মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করে দেখেছে, মেয়েটার চেষ্টা আছে। ক'দিন আগে তাদের নেক্সট ড্রামাতে শৈবাল যখন জয়তীকে নেওয়ার কথা বলে, তখনই দীপক একটা ইঙ্গিত দিয়েছে জয়তীর জন্যে শৈবাল নাকি 'প্রান্তিকে'র অমুদার কাছেও প্রস্তাব দিয়েছে

শৈবালের মধ্যে প্রেমরোগের বালাই নেই। মেয়েমানুষের জন্যে ছোঁকছোঁকানিও নেই। তাহলে কি ওর অভাব দেখে করুণা। করুণা থেকে–।

'এসেছেন কল্যাণদা। আপনার ফ্রেন্ড কই?' রাইটার্সের প্রদীপ্ত ঘোষ।

'শৈবাল! বাড়ীতে ওর কাজ আছে!'

'কি ব্যাপার? খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে!'

'না না।' কল্যাণ হাসল। বলল, 'তুমিও একা।'

'রমেনরাও এসেছে। বসে পড়েছে সামনে।'

গেটের পরই বিরাট প্যান্ডেল। সামনে স্টেজ। চেয়ারে দর্শক। এখনও প্রচুর খালি। 'কল্যাণদা আপনার ওই জয়তী মিত্র, যাই বলুন ওর দ্বারা হবে না।'

'কেন বল দেখি?'

'নিন সিগারেট ধরুন।' প্যাকেট বাড়াল প্রদীপ্ত ঘোষ। বলল, 'আমার চেয়ে ভাল বোঝেন আপনি।'

'জয়তীর অবস্থা তো জান।'

'গরীব। কিন্তু শিল্পকলায় অর্থনৈতিক দীনতাটা কোন ফ্যাক্টার নয়। তবে জয়তীর এমন মালদার প্রেমিক যখন রয়েছে, তখন অভাবটা কিসের?'

শারদীয়

শনিবারের চিঠি

দীর্ঘদিন পর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে। নিয়মিত সাপ্তাহিক রূপে নতুন চেহারায় গত ২০ অক্টোবর, ১৯৮৪ থেকে আপনাদের হাতে পৌছুচ্ছে।

এবার নবরূপে শারদীয় সংখ্যা আগামী সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হতে চলেছে।

'শারদীয় শনিবারের চিঠি'র অন্যতম আকর্ষণ হল ২টি উপন্যাস, লিখেছেন –

নিমাই ভট্টাচার্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কল্যাণ চমকে উঠল, 'প্রেমিক ? কে ?'

'নামটা ঠিক বলতে পারছি না। এক ব্যবসাদারের ছেলে। তিনটে কাপড়ের দোকান। স্কুটারে করে জয়তীকে নিয়ে তো ঘুরে বেড়ায়।'

কল্যাণ ভাবল, কালই শৈবালকে সাবধান করে দিতে হবে।

৩

অনুপ ক্লাবরুমের সামনে স্কুটার দাঁড় করাতেই সুব্রত এসে হ্যান্ডেলে হাত রাখল। লোডশেডিং। মোমবাতি জ্বলছে ঘরের মধ্যে। আলো থাকলে ক্যারাম নিয়ে বসে সবাই।

'কি রে তুই যে পরশু বললি, আজ লাইটহাউস যাবি !'

'সেরকমই কথা ছিল। হল না !'

'শালার লোডশেডিং একটু যে ক্যারাম পিটব।'

'মোমবাতিতে খেল্ !'

'না। ভাবছি সনতের কাছে যাব।'

'তোর নায়িকাকে দেখলাম।'

'কে, জয়তী ?'

'হুঁ। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একজনের সংগে কথা বলছে। হ্যান্ডসাম এক ছোকরা।'

অনুপের ফরসা গোলগাল ভরাট মুখ। নাক সামান্য চাপা। প্যান্টের উপর গোলাপী গেঞ্জি। স্কুটারেই বসে আছে। সকালবেলাতে ফোন করে জয়তী জানিয়েছে তার শরীর খুব খারাপ। গা জ্বরজ্বর, ব্যথা। কোনক্রমে উঠে এসে ফোন করছে। সিনেমা যাওয়া হবে না। সেই জয়তীই কি না গল্প করছে।

অনুপের ভাবনামাত্র রক্ত উষ্ণ হয়ে পড়ে। চিবুক শক্ত হয়ে যায়। সুব্রতকে বলবে নাকি ? জয়তীর সংগে প্রেম সকলেই জানে, সে বিয়েও করবে। থিয়েটারে পঞ্চাশ একশ টাকা রোজগার তার একেবারেই বরদাস্ত হয় না। সাহায্যও নেবে না। অভিনেত্রী হবার নেশাও খুব। বিয়ের পর অবশ্য সে বন্ধ করবে। বিয়েতে বাবা দাদারা রাজী না হন, মায়ের সমর্থন সে পাবে। কিন্তু জয়তীরই বাধা। সংসারের দায়িত্ব তার মাথায়। কিন্তু অসুস্থতার মিথ্যেটা তাকে বলা কেন ? কে হতে পারে ? গোপাল বলে, ওসব মেয়েদের আবার চরিত্রের বালাই রয়েছে। তুমুল বির্তক সে করেছে। তবে সে কেন অন্যরকম ভাবছে ! নিষিদ্ধ আঁশটে গন্ধের অনুভূতিতে ভরে তুলছে মনকে !

'এই অনুপ, কি হল ?'

'তুই যাবি আমার সংগে ?'

'তোর গলা বদলে গেল। আরে বাবা থিয়েটারের মেয়ে। ওদের অভিনয় স্টেজে করলেও, রিহার্সেল সব সময়ই দিতে হয়।'

অনুপ কথা বলল না। স্কুটারে স্টার্ট দিল।

৪

আশিসবাবু ইদানীং সব ব্যাপারেই ক্ষুব্ধ। শান্তশিষ্ট মানুষটির বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে থাকে সর্বদা। হাঁপের টানের সংগে চোখের তারা বড় বড় করে চিৎকার করেন। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে যে কোন সময় এই দুশ্চিন্তায় বাড়ির সকলেই সন্ত্রস্ত। চার মেয়ে এবং ছেলেরা। যত রাগ তাঁর স্ত্রীর উপর। চোখের সামনে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, সংসার নষ্ট হতে বসেছে। মেয়েরা তাঁকে অগ্রাহ্য করে। দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না। ঘর ভাড়া বাকী। এসব কিছুর জন্যেই তাঁর স্ত্রীকে দায়ী বলে মনে হয়। জয়তী কিছুটা ব্যতিক্রম। তাকে দেখে। কোথা থেকে টাকা আনে ঈশ্বর জানেন। বাকী তিন মেয়েরও সাজসজ্জার অর্থ কোথা থেকে আসে ! আশিসবাবুর অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। উনিশ বছর বয়স থেকে চাকরি করছেন। অনেকগুলি সন্তান তাঁর জীবনে কোনদিনই সুস্থতা ছিল না। রোগ, অভাব নিত্যসংগী হয়ে থাকল। তবু চাকরিটা থাকলে কোনক্রমে দিন চলত। মেয়েদের বিয়ে, ছেলেদুটোকে পড়াশুনা করানো, কোনটাতেই তাঁর আগ্রহ নেই। অজস্র সমস্যা তাঁর ভাবনাকে স্থাণু করে দিয়েছে। সময় সময় কোন কোন ঘটনা তাঁকে উত্তেজিত করে। জ্বালা ধরায়। ঝাঁপিতে আটকানো ক্রুদ্ধ সাপের মত শুধু ফোঁস ফোঁস করেন।

একটু আগে অনিরুদ্ধবাবুর কাছে তিনি শুনলেন, জয়তী পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে একজনের সংগে গল্প করছে। জিজ্ঞাসা তিনি করেন নি। গলির মোড়ে লঘু পায়ে হাঁটছিলেন। সন্ধ্যার টিউশনিটা মোড়ের মাথায় ঘোষেদের বাড়ীতে। অনিরুদ্ধবাবু আটকালেন -- কোথাকার যেন বড়বাবু লোকটা। লম্বাটে গড়ন, বড় বড় ধূর্ত চোখ। বাড়ি করেছেন। স্বভাব অত্যন্ত খারাপ। এ বয়সেও মেয়েদের উপর বিশ্রি রকমের দুর্বলতা। প্রায়ই বাড়িতে আসেন। আশিসবাবু জানেন তাঁর কারণ। 'পড়াতে যাচ্ছেন' বলেই শুনিয়ে দিল। আশিসবাবু উত্তর দেন নি।

অনিরুদ্ধবাবুকে পিছনে রেখে কিছুটা হেঁটে আবার তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। জয়তী তার জন্যে ওষুধ আনতে বেরিয়েছে। ওষুধ আনতে গিয়ে কি না পার্ক স্ট্রীট। ওষুধের দোকান তো সামনের মোড়ে পরপর তিনটে। ফিরতে দেরী দেখে তিনি ভেবেছিলেন, নিশ্চয় কাছে কারও কাছে গিয়েছে। কিংবা আশপাশের দোকানে না মিলতে ওই বাজারের দিকে। তা নয় পার্ক স্ট্রীট। ভাবতেই বুকের মধ্যে জোরালো ধাক্কা লাগে তাঁর। রোগা শরীরটা কুঁজো হয়েছে। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। বসা গাল। ধুতির উপর খাদির পাঞ্জাবি। ঢলঢল করছে।

'মেয়ের জন্যে ভাবছিলে না, মেয়ে দেখগে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একটা ছেলের সংগে–'

ছন্দা নামের প্রৌঢ়া রমণীটির গায়ে ছেঁড়া ছাপা শাড়ি। দারিদ্র্য পীড়িত মুখ। একটা কথাও বলেন না। ঘোমটা খসা পান্ডুর মুখের চোখ জোড়া কেবল জ্বলে।

'কি হল, চুপ করে আছো !'

'আমি কারও জন্যে ভাবি না।'

'তাহলে আমিই ভাবছিলাম। আসুক–আসুক আজকে –। হ্যাঁ, পাড়াতে যেন ওষুধের দোকান নেই। সকাল থেকে বিছানায় ঢঙ্ করে আবার পড়ে ছিল !'

'ওষুধ আনতে টাকা লাগে।'

'টাকা ! টাকা !' আশিসবাবুর গলার শিরা ফুটে বের হয়। চোখ জোড়া ছিটকে আসতে চায়। টাকার উপর যেন প্রচন্ড ঘৃণা প্রকাশ পায় উত্তেজিত তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তিতে।

৫

শৈবাল জয়তীর সাক্ষাৎ নেহাতই আকস্মিক। শৈবাল অরুণের ফোন পেয়ে পার্ক স্ট্রীটের অফিসে আসে। অরুণের দাদা পি জিতে কাল ভর্তি হয়েছেন। শৈবালের ডাক্তার বন্ধুর সংগে অরুণ তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানায়। সেজন্যেই আসা। ফোন পাবার আগেই কল্যাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। যা হোক অরুণকে নিয়ে পি জির দিকে যাবার সময়ই জয়তীর সংগে মুখোমুখি দেখা। জয়তী পার্ক স্ট্রীটে একটা পাবলিসিটি ফোরামের টাইপিস্ট তার বন্ধু শুভ্রার কাছে কুড়ি টাকা ধার করে ফিরছিল। বাবার ওষুধ কেনার জন্যে। গায়ে তার জ্বর রয়েছে তখনও। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলার সময়ের মাপ ছিল বড় জোর এক মিনিট ! আর সংলাপ !

'আরে আপনি ! ভাল তো ! কোথা এসেছিলেন ?'

'এই বন্ধুর কাছে।'

ব্যস। □

বিজয় সিং নাহারের স্মৃতিচারণা

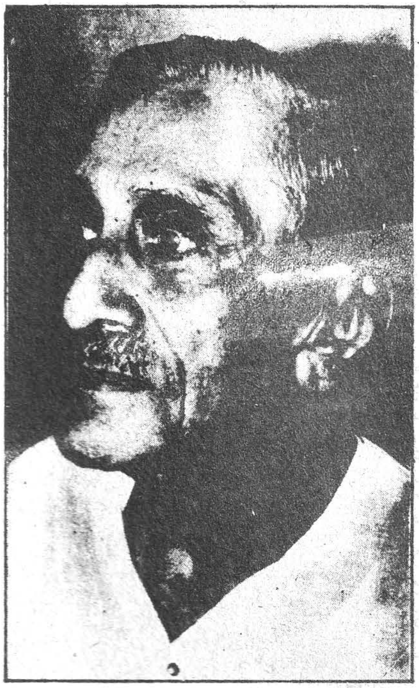

দেখতে দেখতে সময় গড়াতে লাগল।

১৯৩১/৩২ সালের কথা। আমি ছাত্র আন্দোলনের সঙেগ যুক্ত হয়ে পড়েছি। তখন বাংলায় দুটো ছাত্র সংগঠন ছিল। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর অল বেঙগল স্টুডেন্টস এ্যাসোশিয়েশান আর সুভাষচন্দ্র বসুর বেঙগল প্রেসিডেন্সী স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েসন। আমি সুভাষচন্দ্র বসুর সংগঠনে ছিলাম। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম। ঠিক হল দুটো সংগঠন মিলে মিশে এক হয়ে কাজ করবে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব দেওয়া হল সুপ্রসিদ্ধ জননেতা সতীন সেনের ওপর। বরিশালের সতীনদা। দৃঢ় মনোভাবের মানুষ। ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন দল বেঁধে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সামনে পিকেটিং করতে হত। ছাত্রদের বোঝাতাম দেশের পরাধীন অবস্থার কথা। বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে বহু ছাত্র এসে যোগ দিত আমাদের সঙেগ। এইভাবে কত ছাত্রের মনের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি তার ঠিক নেই। রিপন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামিনীকুমার ঘোষ ছাত্র আন্দোলনের জন্য আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। আমাদের গোটা আন্দোলনটাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গড়া। আমরা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলাম। ইংরেজ সরকারের বুলেটের সামনে পড়তে হয়েছে কতবার। আমাদের সংগঠনের কার্যালয় ছিল মীর্জাপুর স্ট্রীট-এর সিটি কমার্স আর পুঁটিরামের মিষ্টির দোকানের সামনের গলিতে।

সতীনদা রোজ আসতেন।

এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল আমার বাল্য বন্ধু মধুসূদন। তাকে বৃটিশ পুলিশের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট মধুর দেহটাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। সে দৃশ্য আজও আমার দু চোখের সামনে জাগে। তবে মনে আছে সেই দিনগুলোয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বদান্যতার কথা। আহত সত্যাগ্রহীদের শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার রায় ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল খুলে ছিলেন। মধুকে ঐ হাসপাতালেই নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা শুধু স্কুল কলেজের বিলিতি কাপড়ের দোকানের সামনেও সত্যাগহ করতাম। সত্যাগ্রহ চলাকালে একদিকে কিরণশঙকর রায়, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসুর নির্দেশে বিখ্যাত আইনজীবীর সুধীর রায়ের সঙেগ আমাদের যোগাযোগ করতে হত। সুধীরবাবু আবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জামাই।

এই সময়েই একদিন আমরা অনেকেই মীর্জাপুর স্ট্রীটের ঘরে বসে সতীনদার সঙেগ কথা বলছি। পরিকল্পনা চলছে আন্দোলনের। হঠাৎ খবর পেলাম পুলিস ঘিরে ফেলেছে আমাদের আস্তানাটা। তখন দেখেছিলাম সতীনদার ভূমিকা। প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি। সতীনদার নির্দেশে আমরা ঘরের আলমারি, ইত্যাদি থেকে সত্যাগ্রহী সভাদের নাম ঠিকানা লেখা কাগজপত্র নিয়ে উঠে চলে গেলাম ছাদে। তারপর পাশাপাশি লাগোয়া ছাদে নেমে পড়লাম। অন্য বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম সতীনদা গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেফতারের মুহূর্তে তাঁর কন্ঠের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

সেবার ত্রিপুরিতে কংগ্রেস অধিবেশন হবে। ১৯৩৯ সালের কথা। সুভাষবাবু দ্বিতীয়বারের জন্যে কংগ্রেস সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনস্থির করলেন। এর আগে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষবাবু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু এবার সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে লেগে গেলেন স্বয়ং গান্ধিজী। তিনি সুভাষবাবুর দ্বিতীয়বার সভাপতি হওয়া মেনে নিলেন না। মহাত্মা গান্ধীর মনোমত প্রার্থী হল ডঃ পাট্টভি সীতারামাইয়া। কিন্তু সুভাষবাবু সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হলেন। বাংলার খাদিগ্রুপ ছাড়া আমরা সবাই সুভাষবাবুকেই ভোট দিয়েছিলাম। সুভাষবাবুর জয়ে ক্ষুব্ধ হলেন মহাত্মাজি। বললেন, এ পরাজয় সীতারামাইয়ারে নয়, এ পরাজয় আমার। গান্ধিজী ত্রিপুরিতে গেলেন না। গেলাম আমরা, তাতে সুভাষবাবুও যেতে পারলেন না। তাঁর শরীরের অবস্হা অত্যন্ত খারাপ। সভাপতির ভাষণ পাঠ করলেন শরৎচন্দ্র বসু। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে, সুভাষবাবুর অনুপস্হিতিতে সভা পরিচালনা করবার ভার দেওয়া হল জহরলাল নেহেরুকে। কিন্তু আমরা, সুভাষবাবুর সমর্থকরা, এটা মেনে নিতে পারলাম না। আমরা চাইলাম শরৎবাবু সভা পরিচালনা করুন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলমাল সৃষ্টি হল। আমরা সুভাষবাবুর সমর্থকরা ছাড়বার পাত্র নই। সভা যাতে না চলতে পারে সেই জন্য তুমুল চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। সবাই চীৎকার করে বললুম, জহরলাল নয়, শরৎবাবু বক্তৃতা করবেন। ওদিকে জহরলাল মাইক ছাড়লেন না। উনিও অনড়। এক ঘন্টা আমরাও বিরামহীন শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছি। জহরলাল ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাইকের সামনে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। জহরলাল, তোমার কথা আমরা শুনবো না, আর উনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। আমরা দূর থেকে দেখছি নেতারা মন্ডপে বসা শরৎবাবুকে কী যেন অনুরোধ করছেন। কী কথা হচ্ছে তা দূর

থেকে আঁচ করতে পারছি না। এদিকে সভা ভন্ডুল হবার দাখিল। শরৎবাবু উঠে এসে আমাদের থামতে নির্দেশ দিলেন। উনি মাইকে ঘোষণা করলেন, সুভাষবাবুর পরিবর্তে জহরলালই সভা পরিচালনা করবেন। ওঁর কথায় শান্তি ফিরে এলো। সভা নির্বিঘ্নে শুরু হোল।

সেই সময় সুভাষবাবু কোনো ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেননি। সভ্যদের নাম ঘোষণা করা হয়নি। সুভাষবাবু চেয়েছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সীকে সেক্রেটারী করতে। প্রতিপক্ষ রাজি হয়নি। উনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে জহরলালের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু জহরলাল সুভাষবাবুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সম্ভব হোল না

এই ব্যাপার গড়াল অনেক দূর। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়েও সুভাষবাবুর বিরোধিতা করলেন দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

এরপর ১৯৩৯ সাল। সুভাষবাবু পদত্যাগ করলেন নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন ড: রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অধিবেশন বসেছিল কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। আমি অভ্যর্থনা সমিতিতে ছিলাম। এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সকলের মধ্যেই একটা ক্ষোভ ছিল সুভাষবাবুর ব্যাপারে। তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল সন্দেহ নেই এই ঘটনার পর সুভাষবাবু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন। এটা ছিল মূল কংগ্রেসেরই একটা গোষ্ঠী। প্রদেশ-কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই সুভাষবাবুর দলে। আমরা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস এ্যাড হক কমিটিতে রয়ে গেলাম আমাদের ব্যঙ্গ করে বলা হত ঢেক্ ঢেক্ কমিটি।

একথা ঠিক সুভাষচন্দ্র আমাকে স্নেহ করতেন। অন্তর্ধানের মাত্র তিনদিন আগে সুভাষবাবুর ভাইপো গণেশবাবু এসে আমায় বললেন, কাকার শরীর খারাপ। তোমায় একবার ডেকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলাম। উনি আমায় আন্দোলনের ব্যাপারে নানান উপদেশ দিলেন। কিভাবে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। সেই একান্ত সাক্ষাতের সময়ে নতুন করে অবিষ্কার করে ছিলাম তাঁর মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা। গান্ধিজীকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন সুভাষবাবু। যাই হোক সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, তিনদিন পর তিনি অন্তর্ধান করবেন।

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি। মৌলনা আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি। তখন আমরা

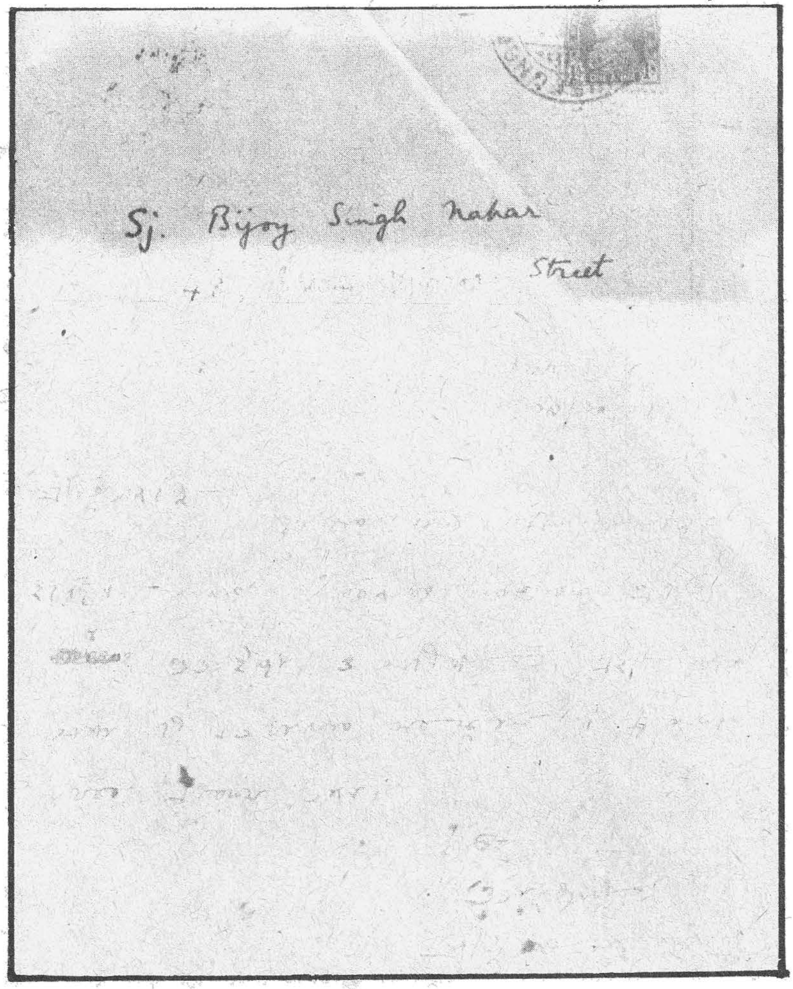

● কার্শিয়াং থেকে বিজয় সিংহ নাহার-কে লেখা সুভাষ বসু-র চিঠি

তালতলার হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারে অ্যাড হক কমিটির সভা করেছিলাম। আমি তখন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। আমার নেতৃত্বেই সেই সভা অনুষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এই কাউন্সিলার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার মতান্তর হয়ে গিয়েছিল। সভাষবাবুর দল আমাদের সহকর্মী মহেন্দ্র সরকারকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে ছিল।

সুভাষবাবু মহেন্দ্রবাবুর হয়ে হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারে সভা করেছিলেন। সুভাষবাবুর সে প্রচারের প্রভাবের কথা ভেবে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তখন অ্যাড হক কমিটির প্রভাবশালী সদস্য কিরণশঙ্কর রায়ের মাধ্যমে আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজিও হলেন এবং বক্তৃতা করলেন আমার হয়ে।

তখনকার কাউন্সিলার নির্বাচনে এখনকার মত প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রই ভোটাধিকার পেত না। বাড়ির মালিকরাই (যাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে) শুধুমাত্র ভোট দিতে পারতেন। নির্বাচনের প্রচার বুথের সামনে দাঁড়িয়েই করা যেত। সেই নির্বাচনের দিন সুভাষবাবুর দাদা শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু বুথে এলেন মহেন্দ্রবাবুর হয়ে ক্যানভাস করতে। আমিও বুথে ছিলাম। শরৎবাবু আমায় স্নেহ করতেন কাজেই বুথে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রচার করতে পারলেন না। আমি নির্বাচনে জিতে গেলাম প্রচুর ভোটের ব্যবধানে।

১৯৪১ সাল। বৌবাজার ১১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নটবর দত্ত মারা গেলেন হঠাৎ। এখানকার উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্যে মনোনয়ন পেশ করলেন বিপিনদা (গাঙ্গুলি)। বিপিনদা আগে কাউন্সিলার ছিলেন। তাপর রাজনৈতিক কারণে জেলে গিয়েছিলেন। যাই হোক, বহু-বাজারের ঐ কেন্দ্রটিকে কেন্দ্র করে

একটা দারুণ কান্ড ঘটে গেল। ঐ আসনটির জন্যে সুভাষবাবু রাজকুমার বসু:কে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনদা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করাও যায় না—এইসব ভেবে সুভাষবাবু কুমার সিং হলে এলেন এবং বিপিনদাকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্যে অনেক অনুরোধ করেও ব্যর্থ হলেন। বিপিনদা জেদ ধরলেন তিনি প্রার্থী পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন না কোন ভাবেই।

দেখতে দেখতে নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। দেখতাম বিপিনদা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। বিপিনদার টাকা নেই, লোকজন নেই। এদিকে রাজকুমারবাবু সুভাষবাবুর সমর্থন পেয়ে প্রচারের সুযোগ পাচ্ছেন ব্যাপক ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকুমরবাবুই হেরে গেলেন। সে এক চমকপ্রদ ব্যাপার।

১৯৪২ সাল থেকে ৪৫ সাল পর্যন্ত আমার জেল হয়েছিল একথা আগেই বলেছি। কারণটা বলিনি। এবার সেইটেই বলি।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে সিভিল প্রোটেকশন কর্মিটির অফিস ছিল। প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। চেয়ারম্যান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সেক্রেটারি ভূপতি মজুমদার, আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি। যুদ্ধের সময় বোমার আক্রমণ প্রতিরোধ উদ্দেশ্যেই কর্মিটি গঠিত হয়েছিল। জাতীয় কর্তব্য পালনের আড়ালে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সেই সময় সুভাষবাবু ব্রহ্মদেশ থেকে এগিয়ে আসছেন। বার্মা রেডিও থেকে নানা রকম নির্দেশ দিতেন। আমরা সেগুলি খাতায় নোট করতাম। সাইক্লোস্টাইল করা সে কাগজ ইংরেজি ও হিন্দিতে বেরোত। নাম দিয়েছিলাম কুইট ইন্ডিয়া এবং করেঙেগ ইয়ে মরেঙেগ। একজন হিন্দুস্থানী আমার বাড়িতে কাগজ দিয়ে যেত। সেদিন ছিল ১ অক্টোবর। লোকটার হাতে কাগজের বান্ডিল দেখে একজন সার্জেন্ট খুব সন্দেহ করল। তারপর লোকটার পিছু নিয়ে সার্জেন্টটা আমাদের বাড়ি চিনে নিল। লোকটা সমস্ত কথা আমাকে সবিস্তারে বললে। আমি বুঝতে পারলাম কি ঘটছে। লোকটাকে টাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। কাগজগুলোও আমি অন্যত্র পাঠিয়ে দিলাম। জানতাম পুলিসের হাঙ্গামা হবে। পুলিস এল। পেয়ে গেল সুভাষবাবুর বক্তৃতার একটা কপি। সে কপিতে বোমা তৈরি ইত্যাদির নির্দেশ ছিল যার সাজা দশ বছর কারাদন্ড। কিন্তু আমার বাল্যবন্ধু মধুসূদন রায়ের চাতুরিতে আমরা গুরুতর সাজার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। মধু একজন সেপাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে তার খাতা থেকে কাগজটা বার করে উনুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। তবুও আমার জেল হল। বিনা বিচারে তিন বছর আটক থাকতে হল প্রেসিডেন্সি জেলে।

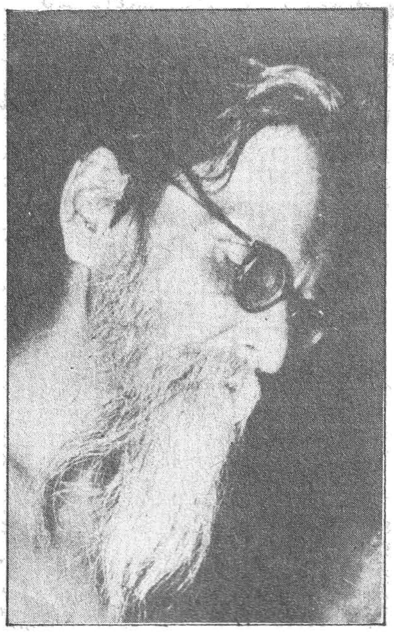

● বিনোবা ভাবে

• চলবে

শারদীয়

শনিবারের চিঠি

প্রয়াত সাহিত্যিক বনফুল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অগ্রগণ্য লেখক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হবার পরই মৃত্যু তাঁকে চিরদিনের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। অসমাপ্ত উপন্যাসটি এতদিন লেখকের নিজস্ব টেবিলে কাগজপত্রের মধ্যে চাপা পড়ে ছিল। আমরা সেই অসমাপ্ত পান্ডুলিপিটি পেয়ে বাংলা সাহিত্যের তিনজন খ্যাতনামা লেখকের হাতে রচনাটিকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছি। তাঁরা সানন্দে এই পূর্বসূরী লেখকের উপন্যাসকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এই তিনজন সাহিত্যিক হলেন

বিমল মিত্র, নবনীতা দেবসেন এবং বিমল কর।

এই অসাধারণ এবং বিস্ময়কর উপন্যাসটি এবারের 'শারদীয় শনিবারের চিঠি'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

গোসাবা ঃ দুই শরিকের সম্পর্কে চিড় ধরাবে কি ?

১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হবার কথা। বাকী ষোল মাস সময় রাজনৈতিক দিক থেকে আদৌ বেশি নয়। এ সময় চব্বিশ পরগণার গোসাবায় আর এস পি-সি পি আই (এম) সংঘর্ষ, বামফ্রন্টের দুই শরিকের সম্পর্ক কতটা তিক্ত করেছে, বা এ তিক্ততার প্রভাব সামনের নির্বাচনে কতটা –, তার জন্য এ আলোচনা জরুরী।

গত ২৯ জুলাই, চন্ডিপুর মন্মথপুর পাকা সড়কের কাছে নিহত হয়, সি পি আই (এম) দলের কৃষক সভার তিন সদস্য। পরে আরো একজন মারা যায় হাসপাতালে।

পুলিশের অনুমান এ আক্রমণ আর এস পি সদস্যদের এক তরফা। লক্ষ্য করবার বিষয়, এ ঘটনায় একজন আর এস পি সমর্থকের গায়েও আঁচড় লাগেনি বা পরে তাদের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নি।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ব্যাপারটা কি পূর্বকল্পিত ?

সি পি আই (এম) দলের চব্বিশ পরগনার জেলা সম্পাদক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বললেন–, "জমি বিবাদ যাতে খুনোখুনি পর্যায় না ওঠে তার জন্য বামফ্রন্টে বহু আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যে, লোকাল কমিটির সেক্রেটারি, কৃষকসভার সম্পাদক আর ওদেরও দুজনকে নিয়ে যে কো–অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা তার কাছে সমস্ত বিবাদ ফয়সালার জন্য হাজির হবে। যদি দেখা যায় ফয়সালা হলো না–তবে তা জেলা স্তর থেকে ক্রমশ: ওপরের স্তরে উঠবে। পয়লা আর সাতই আগষ্ট, এ সব নেয়ে দুপক্ষের বসবার কথা ছিল। অথচ কি হয়ে গেল–"

এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সমর্থন আর এস পির তরফ থেকেও মিলেছে।

মৃত চার জনকে সি পি আই (এম) দল তাদের সক্রিয় সদস্য বলে দাবি করলেও, আর এস পি তা মানতে রাজী নয়। আর এস পি দলের জনৈক মুখপাত্র বললেন: মাদার সর্দার ছাড়া আর তিনজন ছিল নামকরা ডাকাত। এই মাসলম্যানদের সামনে রেখে সি পি আই (এম) স্থানীয় মানুষের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। ওরা একদিনে নটা ডাকাতি পর্যন্ত করেছে, স্পীড বোটে চড়ে। স্থানীয় মানুষ এদের অত্যাচারে অতিষ্ট। জুন-জুলাইয়ের মধ্যে আমাদের গোসাবার অফিস সম্পাদক সুবোধ মাইতি ও পাঠানখালির কর্মীরা আহত হয়েছে।

অত্যাচারে অতিষ্ট মানুষ সেদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল। অথচ এ খুনের জন্য চক্রান্ত করে, কেবল বেছে বেছে আর এস পি সমর্থকদের নাম দেওয়া হয়েছে।

আবার বললেন, "আপনি পরিচয় গোপন করে খোঁজ করে আসুন, দেখুন সাধারণ মানুষ কি বলে!"

পাল্টা জবাব পেলাম সি পি আই (এম) দলের এক নেতার মুখ থেকে ––"ওদের নাম জমি-জমা সংক্রান্ত মামলায় থাকতে পারে কিন্তু চ্যালেঞ্জ করছি–ওদের নামে কোন criminal charges নেই। আবার বললেন,"অনিল বেরা, বলরাম বেরার নাম কেন পুলিশের খাতায়, ওদের জিজ্ঞাসা করবেন।"

ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সি পি আই (এম) দলের এক নেতা, অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,"ঘটনাটা নিন্দনীয় এতে কি কোন সন্দেহ আছে? অথচ আর এস পি খুনীদের হয়ে সাফাই গাইছে? কোন সভ্য দেশে এ ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারেন? ওদের বলতে শুনেছেন আমরা এ ঘটনার মুক্তকণ্ঠে নিন্দে করি?"

আর এস পি নেতাদের সঙ্গে যখন এ প্রসঙ্গে কথা বলি, তাদের তরফে আমাকে জানানো হয় যে তারা স্বীকার করেন ব্যাপারটা 'দুর্ভাগ্যজনক'। সে কথা এই সি পি এম নেতাকে বলতেই, তিনি ফুঁসে উঠলেন, "কোথায়? কবে ওরা বলেছেন?"

আর এস পি নেতা ও মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য গোসাবা থেকে ফিরে অভিযোগ করেন, তিনি সি পি এম দলের সমর্থক ও নেতাদের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন। আর সেখানে তার নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছিল। এ কথা তিনি জ্যোতিবাবুকেও জানিয়ে আসেন। সি পি আই (এম) দলের এক মাঝারি সারির নেতা, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বললেন, 'ননীবাবু যেদিন যে সময় অপমানিত হয়েছেন বলছেন, সেদিন আমরা, মৃত চার কমরেডের দেহ নিয়ে মৌন মিছিল করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ননীবাবু সে মিছিলকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'অযথা উত্তেজনা ছড়াবেন না, পরিস্থিতি আয়ত্বের মধ্যে রাখুন' ইত্যাদি।

সেদিন যথেষ্ট পুলিশ থাকা সত্ত্বেও যদি ননীবাবু তার নিরাপত্তার অভাব খুঁজে পান, তাহলে কি বলা যাবে। নিরাপত্তার অভাবেই চন্ডিপুর, মন্মথপুরের বহু পুরুষ মানুষ এখনও ভিটেছাড়া। দু দলের নেতারা ঘুরে এসেছেন। হাঙ্গামা হতে পারে এমন সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন। তারপরও যদি মানুষ ফিরতে না পারে, তবে আশঙ্কা করা স্বাভাবিক যে দুদিন পরে পুলিশও উঠে যাবে। নেতারাও আসা কমিয়ে দেবেন। তখন?

মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার আচরণে আর এস পি দল খুশী নয়। তাদের মতে, তিনি গোসাবা ঘুরে এলেন একজন সি পি এম সদস্য হিসেবেই। মন্ত্রী সুলভ নিরপেক্ষতা তাঁর আচরণে ছিল না বা গোসাবার মানুষ তাঁর কাছ থেকে তা পায়নি।

মৃতদের রেকর্ডেও ক্রিমিনালস বলার পাশাপাশি এ ঘটনার পরই আর. এস. পি. সেখানে 'পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট' চেয়েছে। কথাগুলো পরস্পর বিরোধী শোনায় বলেই তাদের স্পষ্ট মত জানতে চেয়েছিলাম। ওরা বললেন, 'প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা আর গোসাবার নিজস্ব সমস্যার সুরাহার জন্যই পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট চাওয়া হয়েছে। মৃতদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য করেছিল। সে অভিযোগ আর এস পি-র কাঁধে অন্যায়ভাবে চাপানো হচ্ছে।'

গোসাবা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, পুলিশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে শুনিনি সি পি এম-এর তরফ থেকে। আর এস পি-র কিন্তু ধারণা, সি পি এম দল প্রশাসনিক সুবিধা পাচ্ছে। তার জন্যই বেছে বেছে তাদের সমর্থকদের গ্রেফতার। আগে বামফ্রন্টের ঐক্য বিষয়ে কোন কথা বললে এত 'কিন্তু', 'যদি' শুনতে হতো না, এখন যা হয়। এখন এসব দলের কোন নেতার সঙ্গে কথা বললেই বুঝবেন দু দলের কেউ-ই কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজী নয়।

সি পি আই (এম) দলের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে অনেক অসুবিধা জেনেও আর. এস. পি. সে পথে পা বাড়িয়েছে একটা কথাই প্রমাণ করতে। যুদ্ধ না করে তার ভাগের এক মুঠো জমিও সি পি আই (এম)-কে সে ছেড়ে দেবে না। ঘাঁটি বে-দখল হচ্ছে, এমন অবস্থায় পড়লেই, ঐক্যের কথা তুলে তারা এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

গোসাবার ঘটনায় আর এস পি দল খানিক বিব্রত হয়েছে। হয়তো তাদের এই বিব্রত অবস্থাই সি পি আই (এম) দলকে সে সুযোগ এনে দেবে – যা তারা চায়। সময়ের হাতেই এখন প্রমাণ করার ভার।

□ **বিশেষ প্রতিনিধি**

পুনশ্চ

বাসা

"ভাস্কর"

[বিবেকানন্দ রোডের ব্যবসায়ী ভজহরি সরখেলের গৃহ। ভজহরির পালিতা শ্যালিকা কণিকার সহিত বন্ধু নরহরির বিবাহের পর কয়েক দিন তাহারা ভজহরির বাড়িতেই বাস করিতেছে।]

রাত্রি দুইটা। চারিদিক অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। শুধু রাস্তার একটি আলোর রেখা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া দেওয়ালের এক কোণে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

একখানি বড় পালঙ্কের উপর শুইয়া আছে কণিকা এবং নরহরি। মাঝে একটি পাশ-বালিশ।

কণিকা বলিল, কি, ঘুমুচ্ছ?

কোন উত্তর নাই। কণিকা আবার বলিল, ঘুমুচ্ছ নাকি? তবু কোন উত্তর নাই। কণিকা আর একটু জোরে বলিল, শুনছ?

এবার নরহরি জাগিল। বলিল, কি বলছ?

উঃ, কি ঘুম! তখন থেকে চেঁচাচ্ছি, কানেই যাচ্ছে না!

কই, আমি ঘুমোই নি তো!

আচ্ছা, শোন, একটা কথা বলি। এমন করে আর কতদিন চলবে?

কেন, চলুক না।

আমার বোনের বাড়িতে আমি পড়ে থাকব কেন? তাও আবার পাতানো বোন।

নরহরি বলিল, তাতে কি? তোমার দিদির ছেলেপুলে নেই। তোমার জামাইবাবুর অগাধ টাকা। সুতরাং –

সুতরাং এখানে পড়ে থাকতে হবে? সে হয় না। তুমি কালই মেসে চলে যাও আর শিগগিরই একটা বাসার ব্যবস্থা কর।

কালই?

হ্যাঁ, কালই।

ভজহরির সংগে একটু পরামর্শ করব না?

কারও সংগে পরামর্শ করতে হবে না। জামাইবাবু কি আর বলবেন, তোমরা চলে যাও?

তা হলে, তোমার পরামর্শই নিতে হবে?

নিশ্চয়ই। বিয়েটা হয়েছে অবশ্য তোমার পরামর্শে। তার পর সব আমার পরামর্শ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তাই। এমন করে কুটুমবাড়িতে পড়ে থাকাটা যে ভাল নয়, তা তোমার বোঝা উচিত। তুমি কালই মেসে যাবে। শনিবারে শনিবারে আসবে। যেমন আর সবাই করে। আর তাড়াতাড়ি একটা বাসা ঠিক করে ফেলবে।

বেশ, তাই হবে। এখন ঘুমোও দেখি। তুমি বুঝি সারারাত জেগেই আছ?

নিজের বাড়িতে না গেলে আমার ঘুম হবে না।

একটু পরে দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িল। বিবেকানন্দ রোডের বিচালি-ভবনের দোতালার দক্ষিণ দিকের ঘরখানি আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

পরদিন চায়ের টেবিলে চা খাওয়ার পর নরহরি বলিল, আমি আজ মেসে যাচ্ছি।

ভজহরি বলিল, কেন? কণিকার পরামর্শে বুঝি?

না, মানে ঠিক তা নয়।

তবে?

মানে, যার যার নিজের জায়গায় থাকাটাই ভাল নয় কি?

নিশ্চয়ই ভাল। কণিকাও কি মেসে থাকবে?

নরহরি বলিল, ঠাট্টা নয়। আমি মেসে গিয়ে শিগগিরই একটা বাসার ব্যবস্থা করব। তার পর কণিকাকে নিয়ে যাব।

তা বেশ। এতে আর আমাদের আপত্তির কি আছে?

নরহরি একটি সুটকেস গুছাইয়া লইল। একটি বিছানাও বাঁধা হইল। যাত্রার সময়ে কণিকার চোখটা একটু ছলছল করিয়া উঠল। ভজহরির স্ত্রী বেলা নরহরিকে বলিল, রোজই অফিসের পর এখানে চলে আসবেন কিন্তু।

নরহরি বলিল, রোজ আসা হয়ে উঠবে না। তবে শনিবারে শনিবারে নিশ্চই আসব।

কণিকা শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি?

না, মানে, রোজ রোজ আসা কি আর সুবিধে হবে?

আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার যখন ইচ্ছে আসবেন। কোন সংকোচ করবেন না।

না না, সে কি? ভজহরির বাড়িতে নরহরি আসবে এতে আর সংকোচের কি আছে?

সংকোচের কিছু ছিল না। কিন্তু এখন একটু সংকোচের কারণ হয়েছে বলেই বলছি। ঠিক আগের মতই আসবেন যাবেন, বুঝলেন?

বেলা এই কথা বলিয়া একটু সরিয়া গেল। নরহরি কণিকাকে বলিল, আচ্ছা, আসি তা হলে?

এসো। – বলিয়া কণিকা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে দেখিয়া নরহরি বলিল, কি মুশকিল! এই তো দশ মিনিটের পথ আমার মেস। এর জন্যে এত ব্যস্ত কেন? আচ্ছা, আসি।

এস। একটা বাসার ব্যবস্থা শিগগিরই করে ফেলো।

নরহরি ট্যাক্সিতে উঠিয়া মেসের দিকে যাত্রা করিল। ভাবিতে লাগিল, এই বাসা বাঁধাই বুঝি নারী-জীবনের চিরন্তন সাধ!

২

নরহরির মেস।

সকালে নরহরি তাহার খাটের উপর বসিয়া গুটানো বিছানায় হেলান দিয়া কণিকার কথা ভাবিতেছে এবং অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজ পড়িতেছে। মেসের চাকর হরেকৃষ্ণ চা আনিয়া ভজহরির সামনে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার-টাবার?

চারখানা জিলিপি আর দুখানা সিঙাড়া। আর দেখ, না, থাক্।

কি বলুন না?

না, মানে, দুটো সন্দেশ ওই সংগে।

হরেকৃষ্ণ বলিল, আচ্ছা।

চায়ে একটু চুমুক দিয়াই নরহরি বলিল, আঃ, কি চা-ই করেছ!

হরেকৃষ্ণ বলিল, বাবু, দশ বছর এই চা-ই তো খেয়েছেন। মেসের সবাই বলে, আমাদের হরেকৃষ্ণ একেবারে লিপটনের মাসতুতো ভাই।

ঢের হয়েছে। যা, তাড়াতাড়ি খাবারটা নিয়ে আয়।

মোট কথা, নরহরির আর মেসে মন টিকিতেছে না। প্রত্যহ অফিসের পরে বহির হয় বাসা খুঁজিতে। কিন্তু তাহার এস্টিমেটের মধ্যে সুবিধামত কোন বাড়ি পাইতেছে না। খালি-বাড়ির সন্ধানই পায় না। যদি দৈবাৎ একটা বাড়ির খোঁজ কেউ দেয়, ছুটিয়া গিয়া দেখে, বাড়ি ভাড়া হইয়া গিয়াছে, নয়তো ভাড়া তাহার সাধ্যের অতীত, নয়তো কলিকাতা হইতে এত দূরে যে সেখান হইতে অফিসে যাতায়াত চলে না।

এদিকে বিচালি-ভবনে গেলেই কণিকার ওই এক কথা বাসা ঠিক করতে পারলে?

নরহরি মুখ ভার করিয়া বলে, কই, এখনও তো –

ভারি মুশকিল হল তো!

তা –

আমি আর এখানে থাকব না কিন্তু।

এত কাল থাকলে, আর এখন অমনি –

সত্যি, তুমি শিগগির একটা বাসার চেষ্টা কর।

চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না।

বেলা ও ভজহরি বুঝিতে পারে কণিকা ও নরহরির উদ্বেগ। বেলা বলে, ওরা যখন থাকবেই না, তখন তুমিও একটু চেষ্টা করে দেখ না, একটা ছোট বাড়ি পাওয়া যায় কি না! একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট হলেই ওদের চলে যাবে।

ভজহরি একটু ভাবিল। তারপর বেলাকে বলিল, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

কি?

আমাহার্স্ট স্ট্রীটের এক ভদ্রোলোকের কাছে অমাদের ফার্ম টাকা পেত। তিনি সেটা দিতে পারেন নি, পারবেনও না। তাঁর বাড়িখানা বোধ হয় বিক্রি হয়ে যাবে শিগগিরই। সেই বাড়িখানা ওদের দিয়ে দিলে হয় না?

তা মন্দ কি?

কিন্তু, ওরা আবার যে অভিমানী, নেবে তো?

না নেয়, আপাততঃ না হয় ভাড়াই দেবে।

ইস্, শালীর জন্য কি গরজ!

আমার গরজ? তোমার গরজটাও কিছুমাত্র কম দেখছি নে।

সত্যি, ওদের একটা ব্যবস্থা করে দাও।

নরহরিকে ও কণিকাকেও এ কথা জানানো হইয়াছে। তাহারা দিন গনিতেছে।

আপাততঃ নরহরি মেসেই রহিয়াছে। মেসের চা শুধু নয়, কোন কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছে না। হরেকৃষ্ণ একদিন বলিয়াই ফেলিল, বউদিদিমণির হাতের চা খেয়ে এখন কি আর আমার হাতের চা ভাল লাগবে?

৩

কণিকা ও নরহরি বাসা বাঁধিয়াছে।

নরহরি ছিল যাহাকে বলে কন্‌ফারম্‌ড্ ব্যাচিলার। কণিকা ছিল সমাজের হাওয়ায় উড়ে-আসা একটা ফুল। স্বর্গের হাওয়া গায়ে লাগিয়া তাহারা একত্র মিলিত হইয়াছে ভগবানের অমোঘ অনুশাসনে।

নরহরি নিজের নূতন পরিস্থিতিটা যেন ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। মেসের নরহরি কেমন করিয়া সহসা বাসার নরহরিতে পরিণত হইল, সেটা যেন একটা স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। একটি নূতন মানুষের সংগে তাহার জীবনটা কেমন করিয়া জড়াইয়া গেল, তাহা যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেন এ বন্ধন? কেন এই পরাধীনতা? কেন এই দায়িত্ব? কেন এই ঝঞ্ঝাট? নরহরি ভাবিয়া কোনও উত্তর পায় না।

উত্তর দেয় কণিকা। উত্তর দিতে কণিকাকে কোন কথা বলিতে হয় না। তাহার সান্নিধ্য, তাহার কাজ, তাহার হাসি, তাহার উদ্বেগ, তাহার আদেশ, তাহার উপদেশ – সব মিলিয়া যে উত্তরমালা রচনা করে, তাহার পরে নরহরির যেন আর কোন প্রশ্ন থাকে না। কি সাংঘাতিক এই মোহ!

নরহরির মন ক্রমশ প্রশ্নহীন হইয়া যায়। যেটা সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্ট, তাহা লইয়া দার্শনিকতার অভিনয় করিয়া লাভ কি?

কণিকা ও নরহরি তাহাদের ঘরকন্না গুছাইয়া লইতেছে।

নরহরি এক-একবার তাকাইয়া দেখে, আর মনে পড়ে মেসের নড়বড়ে খাটের কথা, হরেকেষ্টর চায়ের কথা, মেসের ডাল-তরকারির কথা। এইগুলিই যেন তাহার নিজস্ব একান্ত আপন। বর্তমানে গার্হস্থ্য-জীবন যেন তাহার জন্য নয়। কিন্তু –

কণিকা আসিয়া তাহার ভাবস্রোতে বাধা দেয়। বলে, বেলা হল যে, যাও, স্নান কর গে। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে তবে অফিস যাবে। খেয়ে উঠে অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ছোটা ভাল নয়।

নরহরি আবার ভাবে, কই, মেসে তো এমন কথা কেউ কোনদিন বলে নাই!

নরহরি খাইয়া-দাইয়া বিশ্রাম করিয়া আগে হইতে গুছানো কাপড় জামা পরিয়া ধীরে ধীরে পথে পা বাড়ায়। কণিকা পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

বৈকালে নরহরি যখন বাসায় ফেরে, দেখিতে পায় জানলায় কণিকা দাঁড়াইয়া আছে তাহার আসার আশায় পথ চাহিয়া। মেসে তো এমন কেউ তাহার জন্য অপেক্ষা করিত না!

এমনি করিয়াই নরহরি ভগবানের পাতা জালে ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িল।

[শ.চি. ফাল্গুন ১৩৬৩]

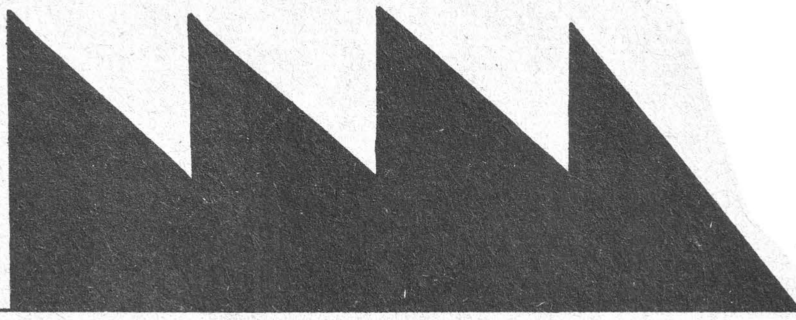

কারখানার কথাকলি

সাহেব আমল

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

– ঠিক কথা। এ তো আমারই খেয়াল করা উচিত ছিল। বেশ তুমি ভাল দেখে ওর মনের মত এক বৌ-এর বন্দোবস্ত কর।

এরপর গাধার বৌ এল। বৌ থেকে ছেলেপুলে।

সাহেব যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ততদিন গাধা বহাল তবিয়তে কোম্পানীর মাঠে চরে বেড়াত। শোনা যায় সাহেব এদেশ থেকে চলে যাবার পরেও এই গাধা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাতেন।

এই সাহেবই যখন কলকাতায় এলেন তখন একসময় শুধু রেশনের চালে কারখানার ক্যান্টিনে সকলকে খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছিল না কাজেই পার্সোন্যাল অফিসার ইউনিয়ানের সংগে মিটিং করে স্থির করলেন যে ভবিষ্যতে ক্যান্টিনে কিছু ভাত কিছু রুটি সকলকেই খেতে হবে। অনন্যোপায় হয়ে ইউনিয়ানও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালো।

– এই কারখানায় অধিকাংশ কারিগর বাঙালী। তারা ভাত খেতে অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে একজন সাহসী শ্রমিক হাজির হল সাহেবের দরজায় – সাহেব আমরা বাঙালী। ভাত খেতে আমরা অভ্যস্ত। এখন আপনাদের পার্সোন্যাল অফিসার রুটি খেতে আমাদের বাধ্য করছে। হুজুর আমাদের মা বাপ। যদি একটু দেখেন।

– শুনছি রেশনে নাকি কম চাল দিচ্ছে?

– রেশনের চাল কে খায় হুজুর। রেশনের চাল তো গোরু ভেড়াও খেতে পারে না। আমরা তো বাড়িতেও খোলা বাজার থেকে চাল কিনে খাই। রেশনের চাল তো দাঁতে কাটতে পারি না।

– রেশন থাকতেও খোলা বাজারে চাল মেলে?

– অঢেল। যত চাইবেন তত। এবং ভাল চাল। কেবল দামটা একটু বেশী। এ তো আর আপনাদের দেশ নয় হুজুর। আমাদের দেশে সবই সম্ভব।

– ঠিক আছে, তুমি যাও।

এরপরেই সাহেবের ঘরে ডাক পড়লো পার্সোন্যাল অফিসারের। পার্সোন্যাল অফিসার যতই বোঝাতে চান, সাহেব বোঝেন না। শেষ অবধি বললেন -- যেখান থেকে পারেন চাল জোগাড় করুন। এরা ভাতই খাবে। রুটি এরা আগেও খায়নি, পরেও খাবে না। আপনাকে রাখাই হয়েছে এইসব কাজের জন্য। যদি না পারেন বলুন আমাকে অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে।

না, অন্য বন্দোবস্ত সাহেবকে করতে হয়নি। তাঁর আমলে কারিগররা ক্যান্টিনে ভাতই খেয়েছিল এবং প্রাণভরে পাগলা খেয়ালী সাহেবের জয়ধ্বনি করেছিল।

এরই পাশাপাশি একটি ছবি মনে আসছে।

একটি ভারতীয় কোম্পানীর মালিকের ড্রাইভার ক্যান্টিনে মাঝে মধ্যে ভাত খেত। সেই-ই অভিযোগ করে থাকবে ভাত অখাদ্য।

মালিক একদিন ক্যান্টিনের কাছে গিয়ে পার্সোন্যাল অফিসারকে ডেকে পাঠালেন।

– আমি আজ তোমাদের রান্নার চাল দেখব।

নিজে গিয়ে চালের বস্তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চাল বের করলেন – এই চাল মানুষে খায়?

– আজ্ঞে রেশনে তো এই চালই দিচ্ছে।

– আমি কিছু শুনতে চাই না। খরচ না বাড়িয়ে কাল থেকে ডাল ভাত খাওয়াবার বন্দোবস্ত করুন।

মালিক চলে যেতে পার্সোন্যাল অফিসার দৌড়লেন ম্যানেজারের কাছে। হন্তদন্ত হয়ে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন।

ম্যানেজার বললেন -- তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। যা করবার আমিই করব।

এরপর মালিক আর কোনদিন ক্যান্টিনের ধারে কাছে আসেন নি। রান্না যেমন হচ্ছিল তেমনই চলতে লাগল।

একটি প্রখ্যাত বিদেশী কারখানার সাহেব ম্যানেজিং ডাইরেকটার এবং সাহেব ওয়ার্কস ম্যানেজারের একটি বিষয়ে মত ও নির্দেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ম্যানেজিং ডাইরেকটার চান কারখানায় সব সময় আলো জ্বালিয়ে কাজ হোক। তিনি এতটুকু অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না। আবার ওয়ার্কস ম্যানেজার চান এতটুকু আলোর অপচয় যেন না হয়। কাজেই তাঁর নির্দেশ বিশেষ প্রয়োজন না হলে যেন আলো জ্বালানো না হয়।

বড়বাবু বলে দিয়েছেন ম্যানেজিং ডাইরেকটারকে দেখলেই সব আলো জ্বালিয়ে দেবে এবং ওয়ার্কস ম্যানেজারকে দেখলেই যতদূর সম্ভব আলো নিভিয়ে কাজ করবে।

বেশ চলছিল।

কিন্তু একদিন, যা কোনদিন হয় না, তাই হয়ে গেল। দু'সাহেবই একসংগে প্রবেশ করলেন কারখানায়।

এখন উপায়! কাছাকাছি বড়বাবু নেই যে একটা মতলব নেওয়া যাবে।

কাজেই কারিগরেরা সম্মানিত অতিথিদের যুগপৎ অভ্যর্থনার জন্য জোনাকী পোকার শরণাপন্ন হল। রাশি রাশি আলো একবার জ্বলে একবার নেভে, একবার নেভে আর একবার জ্বলে।

দুই সাহেবই ক্ষণিক বিস্ময়ে হতবাক। একবার কারখানার দিকে চাইলেন, চাইলেন জ্বলন্ত ও নিভন্ত বাতিগুলির দিকে, তারপর নিজেদের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠলেন।

একটি বিরাট হলঘর। এই হলঘরের এক কোণে সংলগ্ন দুটি ঘর। একটি ম্যানেজারের আর একটি তাঁর সেক্রেটারীর। ম্যানেজারের ঘর দিয়ে সেক্রেটারীদের ঘরে যাবার পথ আছে। তা ছাড়া দুটি ঘর থেকেই পৃথকভাবে হলঘরে বেরিয়ে আসারও রাস্তা রয়েছে। তখন সাহেবের আন্ডারে দু'জন লেডি সেক্রেটারী।

সাহেব অফিসে এসেই একজন সেক্রেটারীকে ডাকলেন। একটা লম্বা সুতোর

একপ্রান্ত তার হাতে দিয়ে বললেন -- তুমি দরজার এই জায়গাটায় সুতোটা ধরে দাঁড়াও। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি। মাপ নিতে হবে।

সুতোর একদিক ধরে সেক্রেটারী দাঁড়িয়ে রইলো, সুতোর আর এক প্রান্ত হাতে নিয়ে সাহেব অন্য ঘরে হাজির। সেখানে দ্বিতীয়াকে সুতোটার অন্য প্রান্ত হাতে দিয়ে বললেন – তুমি এই সুতোটা টান টান করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ফিতে নিয়ে আসছি। মাপ নিতে হবে।

সেক্রেটারীর ঘর থেকে সাহেব সোজা হলঘরে বেরিয়ে গেলেন।

সেক্রেটারীরা সুতোর দুই প্রান্ত ধরে দু ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেনই। সাহেব সেই যে গেলেন একেবারে অগস্ত্য যাত্রা।

ইতিমধ্যে একজন অফিসার সাহেবকে খুঁজতে এসে দুই সেক্রেটারীকে দুই ঘরে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তো অবাক।

– কি করছেন আপনারা ?

– কেন অন্যদিকে সাহেব নেই ?

– সাহেব কই ? আপনারা দু'জনেই তো সুতোর দু'দিক ধরে দাঁড়িয়ে !

সংগে সংগে সকলের চকিতে মনে পড়লো – সেদিন পয়লা এপ্রিল।

তখন টুলরুমের ম্যানেজার রিচার্ডসন সাহেব।

একজন ফিটার একটি যন্ত্রাংশ খারাপ করে ফেলেছে।

সাহেব রেগে আগুন। ফিটারের সংগে সংগে চার টাকা জরিমানা হয়ে গেল।

তবে সাহেবের রাগ তালপাতার আগুন। এই দপ করে জ্বলে উঠলো আবার একটুবাদে একেবারে জল। সবাই জানে রাগের মাথায় সাহেবকে ঘাঁটাতে নেই। কিন্তু ঠান্ডা হতেই ফিটারটি এসে দাঁড়ালো – জরিমানা তো করলে সাহেব। দোষ করেছি, যা দন্ড দেবে নিশ্চয়ই মাথা পেতে নেব। কিন্তু এবারে যা টাকা পাব, তাতে বাড়িসুদ্ধ যে উপোষ করতে হবে। তারও একটা বিহিত আপনি না করলে কে করবে ?

তখনকার দিনে চার টাকা অনেক টাকা আজকালের হিসেবে। সাহেব সব শুনে বললেন – ঠিক আছে, একটা কাগজ নিয়ে এস।

মুড়ি খাওয়ার ডোঙা ফিটারের পকেটেই ছিল। সে সেটা বের করে সাহেবের সামনে রাখতেই, সাহেব তার উপর খস খস করে কি সব লিখে বললেন – যাও এটা ক্যাশে দিয়ে এস। আমি এই মাস থেকে তোমার চার টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম। তবে অপরাধ যা করেছ তার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। সে ব্যাপারে কোন্ মাফ নেই। বুঝেছ ?

– জী হুজুর।

কারখানায় সময় দেখতে বিভিন্ন বিভাগে চারটি বড় দেয়াল ঘড়ি ছিল। টাইমকিপার বিজন চ্যাটার্জির কাজ এই ঘড়িগুলি নিয়মিত মিলিয়ে ঠিকঠাক করে রাখা।

একদিন প্রিন্টিং শপ ম্যানেজার র‍্যালি সাহেব দেখলেন চারটি ঘড়ি চার রকম সময় দিচ্ছে। ডেকে পাঠালেন বিজন চ্যাটার্জিকে।

– তুমি কি সব ঘড়ি ঠিকমত মেলাচ্ছ ?

– হ্যাঁ স্যার। আজই মিলিয়েছি।

– তবে চার ঘড়ির চার রকম টাইম কেন ?

– হুজুর চার ডিপার্টে চার সিজন। প্রিন্টিং সব গরম। এখানে গ্রীষ্মকাল। লেবরেটোরী এয়ার কন্ডিশন করা, সেখানে শীতকাল। উপরের অফিসে সুন্দরী মেয়েরা কাজ করে, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজ করছে আর টাইম অফিসে এখন বর্ষাকাল চলছে। কারখানার মধ্যে চার ঋতু, ঘড়িতে চার রকম সময় হয়ে ধরা পড়েছে।

– ঠিক আছে যাও।

বিজন চ্যাটার্জি ধীর পায়ে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে চোঁচা দৌড়। এখন কয়েক ঘন্টা লুকিয়ে কাটাতে হবে। সাহেবের ঘোর কাটলেই আবার ডাক পড়বে। তখন আর রক্ষা থাকবে না। তবে ঠান্ডা হতেও বেশী সময় লাগবে না। ভরসার কথা ওঁদের মধ্যে রসবোধ আছে। এই নিয়ে পরে নিজেদের মধ্যেই জোর হাসাহাসি করবেন।

প্রেস শপে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে একজন কারিগর যন্ত্রাংশ ভেঙে ফেলেছে। সাহেব দূর থেকে ভাঙার আওয়াজ পেয়েছেন। কারিগরও অবস্থা বুঝে কাজ ফেলে চম্পট।

কিন্তু পালাতে চাইলেই কি পালানো যায়। কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সাহেব পিছনে পিছনে ছুটেছেন। দুজনে দৌড়তে দৌড়তে এল ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টে। এরপর রেল লাইন। লাইনের উপর দিয়েও দৌড় চলল কিছুক্ষণ। নাঃ, শেষ অবধি লোকটিকে ধরতে পারল না সাহেব। মালের স্তূপের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। সাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে বড়বাবুকে নির্দেশ দিলেন – স্যাক দ্যাট ম্যান।

তখন যুদ্ধের আমল। কলকাতায় বোমা পড়ছে। লোক পাওয়াই মুশকিল। বিশেষ করে এই লোকটি সত্যই খুব কাজের।

একসময়ে লোকটি এল বড়বাবুর কাছে – কি করব স্যার।

– এক কাজ কর। কাল থেকে মাথা কামিয়ে, ধুতির বদলে লুঙ্গি পরে কাজে আসবে।

লোকটি বড়বাবুর নির্দেশমত কাজে এল যথারীতি। সাহেব কারখানার এই ধরণের কর্মীদের অনেককেই চিনতেন না। এই লোকটিও সেই অজানা অপরিচিতের দলে হারিয়ে গেল। □

STEELCO SYNDICATE

22, RABINDRA SARANI
(TERETTI BAZAR)
CALCUTTA-73
Phone : 26-0057/
26-8619/26-1485

A House of Quality
STEEL FURNITURE

শিল্প ও বাণিজ্য

মঞ্জুষা বাংলার মৃতপ্রায় হস্তশিল্পের জীয়ন কাঠি

অমলেন্দু কুণ্ডু

১৯৭৬ সালে মঞ্জুষার জন্ম হয়েছিল বাংলার মৃতপ্রায় হস্তশিল্পের শিল্পীদের খুঁজে বার করার জন্য, তাদের হাতে তৈরি শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলতে। উদ্দেশ্য ছিল বড়। কিন্তু সামর্থ্য বা দূরদৃষ্টি ছিল না। তবু পথ চলা শুরু হয়। আর তার ফলস্বরূপ দীর্ঘ প্রায় দশ বছরে অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ আদিবাসী, উপজাতি, অনগ্রসর সুদূর গ্রামবাসীদের কাছে ওরা আজ আশীর্বাদস্বরূপ। লুপ্ত বাংলার ঐতিহ্য ও শিল্পকে ফিরিয়ে আনার এই প্রয়াসকে প্রশংসা না করে উপায় কি?

১৯৭১ সালের আদমসুমারীর পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলার হস্তশিল্পীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু লক্ষ পরিবার। অর্থাৎ দশ লক্ষ মানুষ বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওদের মূলধন শুধু ওদের দুটি হাত। ওই হাত দুটির নিপুণ পরশে কত মূর্তি জীবন্ত কথা বলে, কত ছবি দূরের হাতছানি দেয়, কত কারুকার্য কত কৃষ্টি প্রাচীন বাংলার নবাবি আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওদের হাতে সামান্য মাটি হয়ে ওঠে রমণীয়, সামান্য শোলা হয়ে ওঠে কৃষ্টির আলপনা, সামান্য পেতল হয়ে ওঠে দেবীমূর্তি। কার্পেটের বুননে পাহাড়ের হাতছানি। মাটির ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে যায়, হাতির দাঁতের হাতি, মোষের সিং-এর উট, বাঘ, সিংহের লড়াই বনের আরণ্যকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। শঙ্খ নিনাদে ওরা সন্ধ্যাদীপের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে চলেছে কত যুগ যুগ ধরে।

পঃ বঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম সংক্ষেপে লোকে মঞ্জুষা বলেই জানে। ১৯৭৬ সালে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর থেকে ওকে পৃথক করা হয়। উদ্দেশ্য বাংলার হস্তশিল্পীদের জন্য আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার। সেই থেকে মঞ্জুষার কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন হস্তশিল্পীদের খুঁজে বার করেছে, তাদের হাতে কাজ দিয়েছে, মূলধন দিয়েছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাতে লুপ্ত শিল্পগুলি প্রাণ পায়।

মঞ্জুষার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন বসু জানালেন, বলতে দ্বিধা নেই আমরা এখনও সব শিল্পীর কাছে পৌঁছতে পারিনি। এখনও ৭০ ভাগ হস্তশিল্পী আমাদের নাগালের বাইরে। তবে সপ্তম যোজনার মধ্যে রাজ্যের অন্তত ৬০ ভাগ হস্তশিল্পীর কাছে আমরা পৌঁছবোই। যাতে তারা যে সব জিনিস তৈরি করে তার বাজার তারা পায়। আমরা কাজ দেবো অর্থ দেবো। এর জন্য রাজ্য সরকারের পয়সার কোনও ঘাটতি নেই। ঘাটতি যা আছে তা হল ওদের সংগঠিত করার শক্তির অভাব। আদমসুমারির পরিসংখ্যানে বাংলার হস্তশিল্পীদের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠেনি। সঠিক তথ্য আমাদের কাছে নেই। শিল্পী খোঁজবার তাগিদে আমাদের লোকেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। আমরা লুপ্তপ্রায় হস্তশিল্প ও শিল্পীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি তারা সরাসরি যোগাযোগ করে, আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো। খুঁজে বার করতে চাই সুদূর গ্রামে অরণ্যে, পাহাড়ে কোথায় তারা আছে। এ ব্যাপারে সহৃদয় সংস্থাগুলিকে তিনি যোগাযোগ করতে বলেছেন ওদের ৭/ডি লিন্ডসে স্ট্রীটের দপ্তরে।

তিনি জানালেন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে হস্তশিল্পী অনুসন্ধানের জন্য একটি সার্ভে পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন, যার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

লোকে নিউ মার্কেটে গিয়ে মোরাদাবাদ আর জয়পুরের ব্রাশের জিনিস কেনেন বেশি দামে। একটু এগিয়ে মঞ্জুষার যে কোনও শো রুমে যান, একেবারে খাঁটি বাংলার ডোকরা, টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপের কাঁসা পেতলের দেবদেবীর কত রূপ কত বিচিত্র ঘর সাজানোর বা উপহার দেবার জিনিস। মঞ্জুষা মানেই কাপড়ের দোকান নয়। ওখানে মুর্শিদাবাদ সিল্কের যেমন কদর রয়েছে, তেমনি আছে বালুচরী শাড়ির চাহিদা, দার্জিলিং-এর কার্পেট, হাওড়ার চামড়ার ব্যাগ, জলপাইগুড়ির বেতের চেয়ার, মুর্শিদাবাদের চন্দন কাঠের জিনিস, নদীয়ার শাঁখ, দীঘার ঝিনুকের পুতুল, বোলপুরের কাঠের কারুকার্য করা টি টেবিল পট ও খেসের জিনিস। এমনকি বারাসাত, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্পও দেখতে পাবেন।

কিভাবে শিল্প ও শিল্পীকে বাঁচানো যায় তা নিয়ে বারীনবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি জানালেন সারা দেশে একমাত্র বাংলা আর ত্রিপুরায় শঙ্খ শিল্প রয়েছে, অথচ এদের কাঁচামাল আসে তামিলনাড়ু আর শ্রীলঙ্কা থেকে। আসে গুজরাট ও আন্দামান থেকেও। আগে মহাজনেরা চড়াদামে শাঁখ বিক্রি করতো। এখন সরকার বেসরকারী ভাবে শাঁখ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। যা কিছু কাঁচামাল এখন আমরাই সরবরাহ করি। আমরাই তামিলনাড়ু সরকারের কাছ থেকে কিনে এনে শিল্পীর হাতে তুলে দিই। এর জন্য বছরে এক কোটি টাকা খরচ হয়।

দার্জিলিং-এর কার্পেট বোনা হচ্ছে তিনটি পার্বত্য মহকুমায়। যদিও এটি বাংলার শিল্প নয় বরং তিব্বতের প্রভাব এতে বেশী। তাকদা, মিরিক, আলাগোড়া, বিজনবাড়ী, কালিম্পং, সুখিয়াপাখরি ও সোনাদাতে কার্পেট সেন্টার রয়েছে। ওখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কাঁচামাল সরবরাহ করা হচ্ছে। ওদের সমবায়গুলিকে মূলধনী অর্থ যোগানো হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য উন্নয়ন কর্পোরেশন পাহাড়ি জিনিসের উপর শতকরা ২০ ভাগ রিবেট দেওয়ায় সস্তায় কার্পেট সহ অন্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে।

দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং-এ উল বোনার কেন্দ্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পাঞ্জাব থেকে উল এনে ওদের বুনতে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বুনছেন তাঁদের মজুরী বেড়েছে। এর ফলে পাহাড়ি গ্রামে মেয়েরা ঘরে ঘরে উল বুনে উপার্জন করতে পারছে।

নদীয়ার বিষ্ণুপুর আর নবদ্বীপে কাঁসা ও পিতলের শিল্পকে মঞ্জুষা সাহায্য করছে। ওদের দেড় বছরের এক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। মাসে ৬০ টাকা ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। নবদ্বীপে একটি সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে যাতে কাঁসা পেতল শিল্পীরা ওদের কাজ করিয়ে নিতে পারবে। প্রায় ৩২৫টি পরিবার মঞ্জুষা থেকে সাহায্য পাচ্ছে।

ওদের সমস্যা কাঁচামালের, ওরা ভাঙ্গা কাঁসা পেতলের বাসন গলিয়ে জিনিস তৈরি করে। রোলিং মিল না থাকায় পেতলের চাদর তৈরি করা যাচ্ছে না। খরচ কমাতে হলে এটা প্রয়োজন।

বারীনবাবু জানালেন গত দশকে ষ্টেনলেস স্টীলের জোয়ারে এরা ভাতে মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আবার কাঁসা পেতল ফিরে আসছে। অর্থকরী বস্তু তৈরির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। খাগড়া, নবদ্বীপ, বিষ্ণুপুর এদের মোকাম। ঘাটালে অবশ্য 'ভরন' বেশী পাওয়া যায়।

বাঁকুড়ার কাঁসা পেতল, ডোকরা, টেরাকোটা, স্টেনওয়ার, কাঠের জিনিস তৈরি হয়। তাছাড়া চাদর গামছা হয়। বিষ্ণুপুর বালুচরী শিল্পকে বাঁচাবার প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রায় হাতে বোনা কিছু শিল্পী রয়েছে যাঁরা বালুচরী শাড়ি তৈরি করতে জানেন। মহাজন দাদন দিয়ে ওদের কিনে রেখেছে। মঞ্জুষা এখন মহাজনের বদলে ওদের কাজ থেকে সহায়তা দেবার ব্যবস্থা করছেন।৫/৬জন শিল্পীকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। মঞ্জুষা এর মার্কেট ধরছেন। ওদের চাহিদা অনেক। কিন্তু ৪০ ভাগও পূরণ করা যাচ্ছে না। আসলে যে ২০/২৫জন শিল্পী আছেন তাঁরা যদি ভবিষ্যৎ শিল্পী গড়ে তোলার কথা না ভাবেন তাহলে প্রকৃত বালুচরী লুপ্ত হয়ে যাবে। জলপাইগুড়িতে ওঁরা বেত শিল্পীদের এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওদের জন্য কাঁচামাল আসাম ও রাজ্য বন দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের শিল্পীরা আজ মরণোন্মুখ। হাতির দাঁতের জিনিস রপ্তানীতে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর ওঁরা বিপদে পড়েছেন। মঞ্জুষা তামিলনাড়ু থেকে চন্দন কাঠ কিনে দেবার ব্যবস্থা করছেন।

দীঘায় আগামী বছর একটি হস্তশিল্প কমপ্লেকস্ গড়ে তোলা হচ্ছে তিন লাখ টাকা খরচ করে, ওখানে ঝিনুক শিল্পীরা কাজ ও বাজার পাবেন। ওঁদের ডিজাইন পর্যন্ত দেওয়া হবে।

মেদিনীপুরে বৈষ্ণবগড় মোষের সিং-এর শিল্পকে মদত দিয়ে মঞ্জুষা অন্ধ্র থেকে কাঁচামাল আনছেন। পুরুলিয়ার খোদিয়াদের বাঁশ, বন এবং শালপাতার শিল্পকে মদত দেওয়া হচ্ছে, পুরুলিয়ার বিড়লা মিউজিয়ামের প্রচেষ্টায় যে খেজুরের পাতার ফলেরবাক্স তৈরী হচ্ছে তা এরা বাজারে এনে বিক্রি করছে_। বোলপুরের কাঠ ও বাঁশ শিল্প এবং চামড়া শিল্পকে সাহায্য করা হচ্ছে।

বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা সদনে তৈরি যাবতীয় হস্তশিল্প এবার মঞ্জুষা কেনাবেচা করবেন। এ ব্যাপারে এ মাসেই বিশ্বভারতীর উপাচার্যের সংগে বারীনবাবুর পাকাপাকি কথা হবে।

রাজপুর, কোলাঘাটা, উদয়ভিলায়

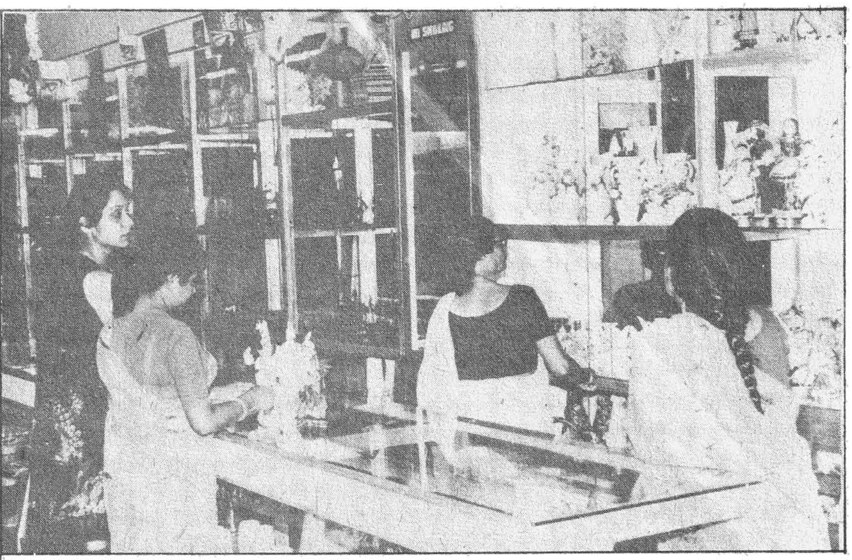

● মঞ্জুষার শো-রুম

সিরামিক শিল্পকে ডিজাইন ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে।

সবশেষে মঞ্জুষা বাংলার প্রাচীন কাঁথা শিল্পকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস শুরু করেছেন। বারাসাত, বীরভূমের লাভপুর, বল্লভীকে ও মুর্শিদাবাদে সিল্কের কাপড়ের উপরে এই কাঁথা শিল্প তৈরী করা হবে। মুর্শিদাবাদ বীরভূমের সিল্ক, শ্রীরামপুরের প্রিন্টিং, মুর্শিদাবাদের গরদ, কোরিয়াল, বিষ্ণুপুর, সোনামুখীর মটকা সাটিংকেও সাহায্য করা হচ্ছে।

হুগলীর রূপনানের চিকন, হাওড়ার চামড়ার ব্যাগ, বাগনানের বাঁশ, রাজবল্লভ হাট, ধনেখালির হ্যান্ডলুম কাপড়, বর্ধমানের পঞ্চগ্রামের কাঠের কাজ, নতুন গ্রামের কাঠের দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতিকে মঞ্জুষাই বাজারের সুযোগ করে দিয়েছে । শোলা শিল্প ও পাটের জিনিসও ওঁরা বেচার ব্যবস্থা করেছেন। ২৪ পরগনার নারকেল খোলার শিল্পকেও ওঁরা সাহায্য করছেন।

বারীনবাবু আগামী বছর থেকে বাংলার হস্তশিল্প বিদেশে রপ্তানী করতে চান। যেমন ডোকরা, চামড়া, সিল্ক, বেত ও ঝিনুকের জিনিস। ইতিমধ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড পঃ জার্মানী ও জাপান থেকে এই সব জিনিস সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাসের ট্রেড মিশনগুলি বাংলার শিল্প সম্পর্কে খোঁজখবর দিতে শুরু করায় বিদেশে বাংলার হস্তশিল্পের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বলে তিনি জানালেন।

কিন্তু মূল সমস্যা এখনও প্যাকেজিং-এ। মাটি বা ঝিনুক বা শোলার জিনিস ভাল প্যাকেজিং না হলে বিদেশ কেন স্বদেশেও বহন করা সমস্যা। তাই তারা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ বিষয়ে সহযোগিতা করার কথা জানিয়ে ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্যাকেজিং-এ প্রশিক্ষণ দিতে রাজী হয়েছেন।

পঃ বংগ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম ১৯৮৩-৮৪ সালে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বেচাকেনা করেছিলেন। গতবছর তা বেড়ে ১ কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছয়। এবার তাঁদের আশা আড়াই কোটিতে পৌঁছে যাবে। সপ্তম যোজনায় এই কেনাবেচা সাত কোটিতে দাঁড়াবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

মঞ্জুষার কলকাতা, দমদম এয়ারপোর্টসহ মোট ১১টা এম্পোরিয়াম থেকে এইসব হস্তশিল্প বিক্রি হয়। সেপ্টেম্বরে আরও ৪টি এম্পোরিয়াম সিউড়ী, কৃষ্ণনগর, ঢাকুরিয়া ও বর্ধমানে খোলা হচ্ছে। নভেম্বরে আরও ৫টি মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বনগাঁ ও শিলিগুড়িতে খোলা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আরও ৪টি বেনারস, জলপাইগুড়ি, বারাসাত ও উল্টোডাংগায় খোলা হচ্ছে। এ বছরের মোট ১৩টি এম্পোরিয়াম নিয়ে মোট ২৪টি এম্পোরিয়াম খোলা হবে।

তরুণ আই. এ. এস. অফিসার জহর সরকারের প্রচেষ্টায় হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমে যে কাজের পরিবেশ তৈরি করে গেছেন, তাকে আরও বাড়িয়েছেন তার উত্তরসূরী বারীন বোস। মাত্র ৯ মাসেই তিনি মঞ্জুষাকে গ্রামের মানুষের অতি নিকটে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

এবার শারদীয়া পূজায় ওঁদের শ্লোগান 'আরও হস্তশিল্প কিনুন'। জনতার পয়সায় মাটির পুতুল কিংবা পেটমোটা বুড়োবুড়ি দেখুন না কেমন আপনার ঘরে আপন মনে হাসির জোয়ার বইয়ে দেবে। □

যাত্রা

যাত্রা/শুধু যাত্রা

।। শিবু পাল প্রযোজিত সাথীহারা ।।

মঞ্জুরী অপেরা গত মরশুমে 'শিল্পী' পালার জন্য একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল! কোথাও থেকে এ দলের নায়ক-গায়ক তপন ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ নায়কের পুরস্কার, কোথাও থেকে পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান। এবার সেই দলের 'সাথীহারা' মুক্তি পাবে ৩১ আগষ্ট, রংগমহলে, দুপুর ১.৩০ মিনিটে। সুনীল চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত, পশুপতি ভট্টাচার্য সুরারোপিত এবং শিবু পাল প্রযোজিত এই পালার কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন তপন ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা রায়, কবিতা কর, সুজয় কর আরও অনেকে। যে হেতু তপনের মত সেরা গায়কই এ পালার নায়ক সেই হেতু পালায় থাকবে অভিনয়ের সংগে গানের পর গান।

।। দীনবন্ধু গুছাইত প্রযোজিত মগের মুল্লুক ।।

নিউ প্রভাস অপেরার এই মরশুমের পালা কানাই নাথের ঐতিহাসিক 'মগের মুল্লুক' মুক্তি পাবে ৩১ আগষ্ট সকাল ৯.৩০ মিনিটে স্টারে। দীনবন্ধু গুছাইত প্রযোজিত এবং তিনকড়ি গুছাইতের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী এই পালার প্রধান চরিত্রে রূপদান ও পালা নির্দেশনায় আছেন পান্না চক্রবর্তী। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন লক্ষ্মী হালদার, অনিমা দত্ত, অনুপকুমার ও শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

।। এম. নস্কর প্রযোজিত অপবাদ ।।

নিউ শংকরী অপেরার নতুন পালা এম. নস্কর রচিত, শক্তি মুখার্জী নির্দেশিত অপবাদ মুক্তি পাবে ২রা সেপ্টেম্বর, মিনার্ভা থিয়েটারে বেলা ৩টায়। পালার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন এম. নস্কর ও গীতা নস্কর।

।। জননাট্য অপেরার কৃষ্ণ সুদামা ।।

জননাট্য অপেরার গীতিবহুল পৌরাণিক পালা কৃষ্ণ সুদামা মুক্তি পাবে ৩রা সেপ্টেম্বর বেলা ১.৩০ মিনিটে মুক্তি পাবে বিশ্বরূপা থিয়েটারে। প্রীতি রায় রচিত ও পঞ্চানন মিত্র সুরারোপিত এই পালার নির্দেশক শক্তি মুখার্জী। বিশেষ চরিত্রে রূপদান করবেন দেবকুমার, রত্না দত্ত, সমীর বিশ্বাস।

।। মুক্ত অংগন যাত্রা সমাজের মা তুমি দেবী ।।

সামাজিক পালার ক্ষেত্রে নির্মল মুখোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। মুক্ত অংগন যাত্রা সমাজ ও তদ্রূপ জনপ্রিয় সামাজিক পালা পরিবেশনের ক্ষেত্রে। এ দলের নতুন পালা নির্মল মুখোপাধ্যায় রচিত, নির্দেশিত, অভিনীত মা তুমি দেবী মুক্তি পাবে ৫ সেপ্টেম্বর বেলা ১.৩০ মিনিটে স্টারে। শ্যামল মিত্র সুরারোপিত এই পালার কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে নির্মলবাবু ছাড়া আর যারা অভিনয় করবেন তাঁরা হলেন কুমার ইন্দ্রজিৎ, বীণা ঘোষ, এবং মীনাকুমারী আরও অনেকে।

তপোবন নাট্য কোম্পানীর কর্ণধার, প্রযোজক, পালাকার, অভিনেতা ও নির্দেশক পুরানে পারদর্শী দুলাল চট্টোপাধ্যায় এবার যোগমায়া অপেরা নামে আর একটা দল করেছেন। এ দলের কুল বধূর কান্না পালার মাধ্যমে দুলালবাবু পণ প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছেন ও বধূ হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন।

।। বিনোদিনী নাট্য কোম্পানীর শত্রু ।।

আগামী ৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১.৩০ মিনিটে বিশ্বরূপায় মুক্তি পাবে জ্যোতির্ময় দে বিশ্বাসের সামাজিক পালা শত্রু। নির্দেশনা, শক্তি মুখার্জী। সুরকার রঘুনাথ দাস। এ পালার কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন শীলা সেন, দীপক ব্যানার্জী, কুমার সৃজিতেশ, সুমিতকুমার, বুলা রায়, কুমার বিশ্বনাথ আরও অনেকে।

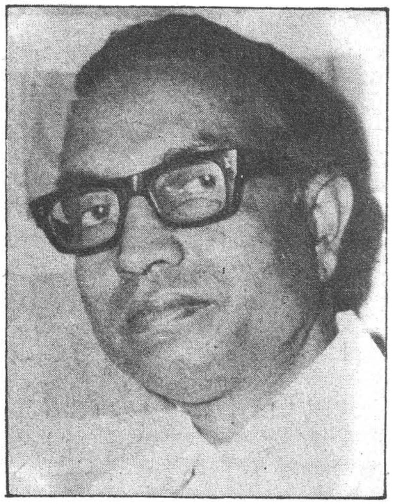

প্রযোজক কালীপদ দাশ।

সত্যনারায়ণ অপেরার কর্ণধার প্রযোজক কালীপদ দাশ; এবার লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা নাম দিয়ে আরও একটি দল তৈরী করেছেন।

বিনোদন

শ্রীদাশ এই দলের ব্যানারে এবার প্রথম বিজ্ঞাপন পালার প্রবর্তন করছেন। প্রধান পালার সংগে প্রযোজক শ্রীদাশ ভারত সরকারের নীতি অনুসরণ করে 'সুখী পরিবার' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘের পালা দেখাবেন। এটি পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রথম বিজ্ঞাপন পালা।

।। গন্ধর্ব অপেরার লায়লা মজনু ।।

নিমাই শূর প্রযোজিত এক সময়ে জনপ্রিয়তার ঝড় তোলা পালা লায়লা মজনু নতুন ভাব ও ভংগিমায় ও আংগিকে মুক্তি পাবে ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় স্টারে। শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত-নির্দেশিত এই পালার শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করবেন ছন্দা চ্যাটার্জী।

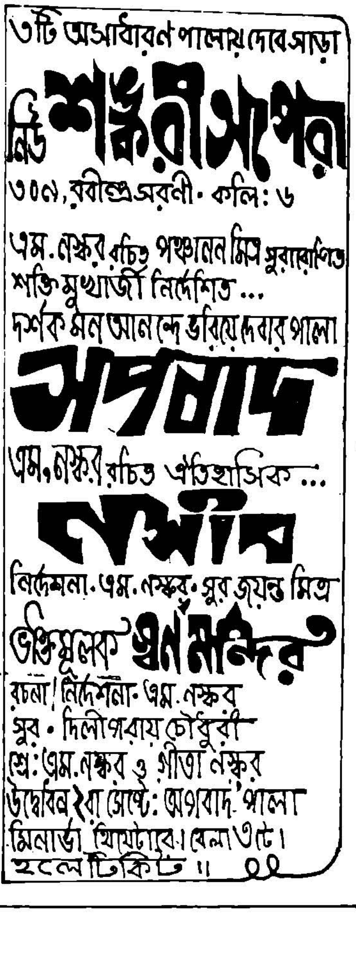

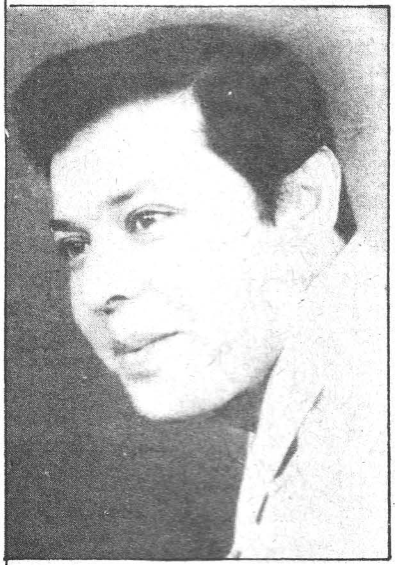

△ জননাট্য অপেরার নায়ক দেবকুমার।

।। গণনাট্যের মহব্বতের ইনাম ।।

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত গণনাট্য নিবেদিত প্রসাদ ভট্টাচার্যের মহব্বতের ইনাম ঐতিহাসিক পালাটি ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত এই পালার মুখ্য অভিনেতা স্বয়ং নির্দেশক

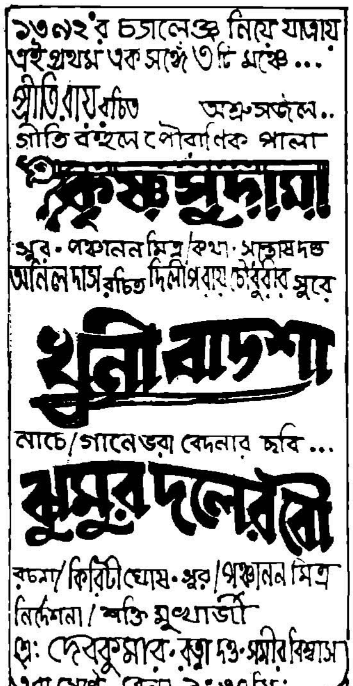

।। তপোবন নাট্য কোম্পানীর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ ।।

তপোবন নাট্য কোম্পানী প্রয়োজিত পুরানরত্ন দুলাল চট্টোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত এবারের পৌরাণিক পালা শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ মুক্তি পাবে স্টার থিয়েটারে ২ সেপ্টেম্বর বেলা ১.৪৫মিনিটে। একটি বিশেষ চরিত্রে রূপদান করবেন স্বয়ং পালাকার-নির্দেশক দুলালবাবু।

।। গোরাচাঁদ রায় প্রযোজিত বিষকন্যা ।।

আর্য অপেরার এবারের নতুন পালা বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত ও শ্যামল সেন নির্দেশিত বিষকন্যার শুভমুক্তির তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর। রঙমহল থিয়েটারে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে পালা উদ্বোধন।

চলচ্চিত্রের নায়ক ও নির্দেশক দিলীপ রায় ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চিতা চ্যাটার্জী এবং শ্যামল সেন আরও অনেকে।

।। বারাণসীতে সত্যনারায়ণ অপেরা আমন্ত্রিত ।।

প্রতি বছরের মত এবারও বারাণসীর শিবালাস্থিত কাশী দুর্গোৎসব সমিতি মহাপূজা লগ্নে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর রাত্রে পল্লীবাসীদের যাত্রা দেখাবার ব্যবস্থা রেখেছেন। এ বছর পর পর ৩ রাত্রে ৩টি পালা আসরস্থ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি কলকাতায় এসে প্রযোজক কালীপদ দাশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই মর্মে সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন সত্যনারায়ণ অপেরা। এ দলের নতুন পালা শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে কমলেশ ব্যানার্জী পালারূপায়িত, জ্ঞানেশ মুখার্জী নির্দেশিত বড়দিদি এবং পৌরাণিক পালা পূজারী মেঘনাথ থাকছে, সেই সংগে একটি ভক্তিমূলক পালাও থাকবে।

শ্রেষ্ঠাংশে থাকছেন, শক্তিমান অভিনেতা দ্বিজু ভাওয়াল এবং নায়িকা জয়শ্রী মুখার্জী। □

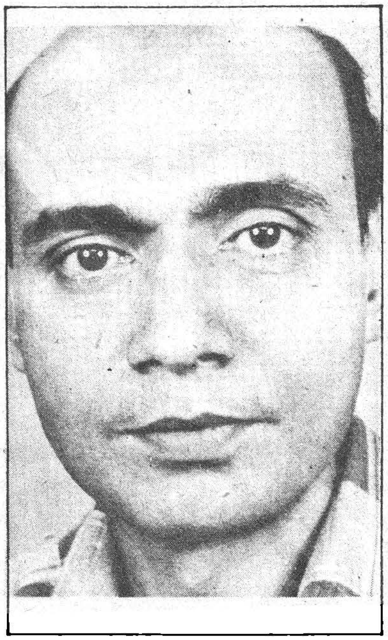

△ নিউ শংকরী অপেরার পালাকার, নির্দেশক ও প্রধান অভিনেতা এম. নস্কর।

গৌরাংগপ্রসাদ ঘোষ

ই. এস. আই-র সংগীত সন্ধ্যা

বিশেষ প্রতিনিধি

সম্প্রতি মানিকতলা ই. এস. আই. হাসপাতাল আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট শিল্পীরা হলেন সুমিত্রা সেন, ধীরেন বসু, নীলাদ্রী শেখর বসু এবং সবিতাব্রত দত্ত।

রবীন্দ্র সংগীতে সুমিত্রা সেন এখন এক বিশিষ্ট শিল্পী, তাঁর কণ্ঠে 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানেরও প্রাণে' 'কোন সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর এসেছো' কিংবা 'বহু যুগের ওপাড় হতে আষাঢ়'-এর মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর দরদী গলা 'গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ'কে এনে মিশিয়ে দেয় গভীর মূর্ছনায়।

বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', রবীন্দ্রনাথের 'তোতার কাহিনী' কিংবা বাচ্চাদের আবৃত্তি নীলাদ্রী শেখর বসুর গলায় যত ভালো লাগে, নজরুলের '.....বিদ্রোহী রণক্লান্ত.....' তেমন দাগ কাটে না। বাজীমাৎ করার জন্যে সব রকম কবিতা আবৃত্তি না করলেও চলে।

ধীরেন বসুর কয়েকটি গান সত্যি মুগ্ধ করে। তাঁর 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়' 'যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি।' 'চল যাই জলদেবী' কিংবা 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' নাড়া দিয়ে যায়। রবীন্দ্র সংগীতের থেকে নজরুল গীতিই তাঁর কণ্ঠে শুনতে ভালো লাগে।

সবিতাব্রত দত্তের গানের আলাদা চার্মই আছে। তাঁর উদাত্ত গলায় যখন শুনি – 'গংগা সিন্ধু নর্মদা', 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান' কিংবা 'মুক্তির ও মন্দির ও সোপানও তলে কতপ্রাণ হল বলীদান' চেতনায় দোলা দিয়ে যায়। এই ৬২ বছর বয়সেও তার গলা অনন্য।

সংবাদ-সাহিত্য

আমরা কোথায় ?

ভারতবর্ষের মালিক থাকাকালে ইংরেজের পরম সহায় ছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী এবং পরমতম শত্রু ছিল বাংলার যুবশক্তি। দেশ-উদ্ধারে উৎসর্গিতপ্রাণ সেই যুবকেরা সম্পূর্ণ সহিংস পদ্ধতিতে দলে দলে আত্মবিসর্জন দিয়া বিদেশী রাজশক্তির ভিত্তিমূলে বারংবার কঠিন আঘাত হানিয়াছিল। পরবর্তীকালে একদিকে বিপ্লবীদলের বিস্তারলাভ এবং পাশাপাশি গণ-আন্দোলন সত্যাগ্রহ অসহযোগ ইত্যাদি গান্ধীজির আন্দোলন এবং সর্বশেষ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র বাহিনীর আবির্ভাব ঘটিয়া শেষতক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে সফলতা লাভ করে। এ কাহিনী সকলেরই জানা।

যুবশক্তির বিকাশে ইংরেজ বরাবর বাধা দিয়াছে। একটি ব্যায়ামচর্চার কেন্দ্র অথবা স্বদেশীদলের কোন আখড়ার সন্ধান পাইলেই সাহেবদের গোলাম বংগীয় অনুচরেরাই কিঞ্চিৎ ইনামের আশায় কর্তাদের কানে সে খবর পৌঁছাইয়া বিকাশকে বরাবর বিনাশে পরিণত করিয়াছে। তবুও এটুকু আজও আমরা সগর্বে ঘোষণা করিতে পারি -- বাংলার যুবকের দল তাহাতে দমে নাই, বরং নূতন উদ্যমে ইংরেজ বিতাড়নের কাজে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজ্যলোলুপ বিদেশীর দল তাহাদের স্বধর্ম অনুযায়ী রাজ্যরক্ষায় যতদূর সম্ভব ক্রূর এবং কৌশলী পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের দোষ দিয়া লাভ কী ? কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর কাশ্মীর-কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ, গুজরাটী স্বমূত্রসেবী, পার্শী-হিন্দু নারীপুরুষ অথবা কশ্চিৎ জ্যাঠামহাশয় -- যিনিই হিন্দোস্তানের সিংহাসনে বসার সুযোগ পাইয়া থাকুন আসলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মাড়োয়ারি বণিকদের করতলগত তাহা সর্বজনবিদিত। ইহাদের নির্দেশেই ভারতরাষ্ট্র চালিত হয়।

এই ধুরন্ধর অদৃশ্য-ভাগ্যনিয়ন্তারাও বুঝিয়াছেন, নিরুপদ্রবে রাজ্য পরিচালনা করিতে হইলে ব্রিটিশ টেকনিক অনুসরণে সমগ্র দেশের, বিশেষত বাংলার যুবশক্তির বিনাশ বা প্রায়-বিনাশ একান্ত প্রয়োজন। নাচ গান সিনেমা যাত্রা হল্লা ভিডি ভিডিও মালয়ালম ছবি যাহা যত বেশিমাত্রায় সাপ্লাই করা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধে করা হইতেছে। এই রাজস্থানীদের পশ্চাতে উঁকি মারিতেছে আমেরিকা রাশিয়া -- দুই বিরাট দৈত্যের ব্যাদিত করাল বদন। সিয়া-কেজিবির স্নেহধন্য কয়েকটি পত্রিকার মাধ্যমে বহুদিন যাবৎ পর্ণোগ্রাফির ঢালাও প্রচার তো চলিতেছেই, দেখাদেখি আগরওয়ালা ঝুনঝুনওয়ালার দল রঘু ডাকাতের মত রে রে করিয়া পত্রপত্রিকার ধারালো অস্ত্রে কচি মুণ্ডু ছেদনকর্মে লাগিয়া গিয়াছে। যেন তেন প্রকারেণ এক বা একাধিক পত্রিকা প্রকাশ লাগাও ক্রাইম ধর্ষণ খুন সেকসের মশলাদার কেচ্ছা গল্প-কাহিনী, বংগভূমির তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীর দল লম্ফ প্রদানে তাহা সংগ্রহ করিয়া গিলিয়া ফেলুক।

তাহাই ঘটিতেছে। এমনিতে প্রোটিন ভিটামিনের অভাবে বংগীয় যুবক-যুবতীদের দেহলতা অত্যন্ত অশক্ত, তাহার উপর ক্রমাগত এইসব অতীন্দ্রিয় মালের চাপে বদহজম হইয়া অচিরেই তলদেশ ফাঁসিয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছি আমাদের আশা ভরসা দেশের তরুণ সমাজ ক্রমে বিপথগামী ও অমানুষ বনিয়া সম্পূর্ণ হতাশার পংককুণ্ডে ডুবিতে বসিয়াছে। রাজনৈতিক দাদারা অতি তৎপরতার সহিত এই ভাগ্যহীনদের কুক্ষিগত করিয়া রোবটে পরিণত করিতেছেন। ফলে বড়বাজার অঞ্চলে খুশীর বন্যা বহিতেছে। নেতাদের সহিত মাড়োয়ারি বণিকদের যোগসাজসে একে একে ইহাদের চাকরিস্থলের দরজা বন্ধ হইয়া আর এক সমস্যার সৃষ্টি করায় রোবটেরা পুরাপুরি অসাড় হইয়া পড়িতেছে।

শিশু যুবা বৃদ্ধদের মনোরঞ্জনের নামে ব্যাঙের ছাতার মত যে সকল বীভৎস পত্রিকার সপ্তাহে গড়ে একটা করিয়া আবির্ভাব ঘটিতেছে তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি বিচিত্র। ভিতরের ছাপা ও ছবি এবং বাহিরের আবরণ কদর্য। প্রকাশ হইবামাত্র মুড়ি মুড়কির মত বিকাইয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত বিপদ ঘটিবে সিপিএম, কংগ্রেস(আই) উভয় দলেরই। উভয়েই মারাত্মক ভুল করিতেছেন এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া। অবিলম্বে আইন বা আন্দোলনের সাহায্যে এই স্লো-পয়জনিং প্রথা বন্ধ না করিলে অদূর ভবিষ্যতে দুই পার্টিই আর তাজা জোয়ানদের খুঁজিয়া পাইবেন না। ক্যাডারগণ আসিবে কোথা হইতে? হতবীর্য মেরুদন্ডহীন ভগ্নস্বাস্থ্য তরুণদের লইয়া 'চলবে না চলবে না' অথবা 'বন্দে মাতরম' চালানো অসম্ভব হইবে। জলে রোদে রাজপথে মিছিল করার ক্ষমতাই ভবিষ্যতের তরুণদের থাকিবে না।

যে হারে এইসব বিকৃতরুচি পত্রিকার জন্ম হইতেছে এবং জন্মিবামাত্র প্রচার সংখ্যার বিপুলতায় শেঠজীদের মুখে মধুর হাসি ফুটাইতেছে -- যাহাদের ধাক্কায় পুরাতন চালু পত্রিকাগুলি ত্রাহি ত্রাহি রবে আর্তনাদ করিতেছে তাহা আজও যদি 'জনতার জ্যোতি'র কর্ণে প্রবেশ না করিয়া থাকে তো আমাদের দুর্ভাগ্য। ইচ্ছা করিলে জ্যোতি বসু মহাশয় মুহূর্তমধ্যে এই মতলববাজদের অংগচ্ছেদ করিতে পারেন। করিলে ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বলতর হইবে।

গোপালদার চিঠি

২৩.৮.৮৫

"ভায়া,

ইচ্ছে করেই অনেকদিন কোন পত্রালাপ করি নি। চুপচাপ তোমাদের রকমসকম দেখছিলাম। বেশ রগড় চালিয়ে যাচ্ছ, ঠান্ডা ঘরে বসে মুখেন ম্যরিতং জগৎ, অফুরন্ত স্তোকবাক্য এবং রাজা-উজীরবধ -- ফিন্‌লে আম্দির চেয়েও ফাইন বলে মনে হচ্ছে। বিলাসিতা এবং অনাচারে আপাদমস্তক ডুবে আছ, তোমাদের মুক্তির উপায় কী হতে পারে গত কিছুদিন ধরেই সে সম্পর্কে ধ্যান করছি। পথের সন্ধান পেলেই জানাব।

ইতিমধ্যে তোমাদের রাষ্ট্রপতি মহা আড়ম্বরে কলকাতা ঘুরে গেলেন। তার জন্যে যে কি ধুন্ধুমার কান্ড, হৈ চৈ ইত্যাদি হল তা দেখার মত। কি বিরাট আড়ম্বর! পরাধীন ভারতবর্ষে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধিরা যে জাঁকজমক, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, গার্ড, গার্ড অব অনার, সেলাম প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন এখানেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখলাম না। স্বাধীন দেশের এই চল্লিশ বছর বয়সে এ কি কারবার! ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগল না। ভাল লাগল না আরও এই কারণে যে ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিন সম্পর্কে পুরনো দিনের একটি কাহিনী মনে পড়ে গেল।

সন্ধ্যার মুখে একটু আফিম্ খেয়ে বসেছিলাম একটা পার্কের বেঞ্চিতে -- অনেকদিন আগে রাষ্ট্রপতি হো চি মিন ভারত সফরে এসে কলকাতা রাজভবনে একদিনের অতিথি হলেন। সুসজ্জিত গেস্টরুমে তাঁর রাত্রিবাস। সবরকম সুখ সুবিধার সুবন্দোবস্ত করা আছে। রাত্রে তাঁর খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন কয়েক টুকরো টোস্ট, একটু দুধ এবং সামান্য একটু সবজি হলেই তাঁর চলবে. এর বেশি কিছু নয়। সেই খাবার খেয়ে হো চি মিন দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লেন।

অতি ভোরে রাজভবনের কর্মচারী একজন দেখলেন প্রেসিডেন্ট একটা জানলার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভোরের আকাশ দেখছেন গায়ে দেবার চাদর ও একটা বালিশ মাটিতে পড়ে আছে। পরম সুখদায়ক গদি-আঁটা পালংক সম্পূর্ণ অব্যবহৃত। মিনমিনে গলায় প্রশ্ন করতেই অতি সাধারণ একটা গলাবন্ধ কোট পরা হো চি মিন বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন যে আমার দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, বিছানার কথা দূরস্থান বারো আনা লোক খেতেই পায় না সেই দেশের নেতা হয়ে আমি বিলাসিতা করব এ কেমন কথা! সামান্য একটু খাওয়া, জীবন ধারণের জন্য যেটুকু দরকার, আর মেঝেতে একটা চাদর পেতে শুলে কোন কষ্ট হয় না আমার, ঘুম ভালই হয়। তোমাদের দেশও তো গরীব ভাই, তবে তোমাদের নেতারা এত আরামে জীবন কাটান কেন?

ব্যাপারটা চিন্তা কর, তফাতটা হৃদয়ংগম কর। হ্যাঁ ভাল কথা। বিলাসী এবং অনাচারীদের পক্ষে একটি দুঃসংবাদ কিছুদিন আগে স্টেটসম্যান পত্রিকায় পড়েছি : "Prices of India-made foreign liquor and other alcohol-based products are likely to go up again in West Bengal soon.... The State Government is planning to take steps to increase sugarcane production in the State..." বিষয় হচ্ছে, আখের অভাবে দেশে মদ তৈরির উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে না। সংবাদটি যেমন তোমাদের অনেকের পক্ষে বিপর্যয়কর মনে হবে, আমারও তাই হচ্ছে। বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার গ্রীন আর্মিটেজের একটি উক্তি অনেকদিন আগে পড়েছিলাম : "Almost all the geniuses of the world have been alcoholics.... Scientific progress towards the conquest of alcoholism.... would undoubtedly decrease the number of geniuses in the future or bring about their total disappearance."

নমস্য ব্যক্তির রায় মাথা পেতে নিতেই হবে -- আমাদের পরবর্তী জেনারেশনে জিনিয়াসের যেন অভাব না ঘটে। মহীরুহ থেকে মহামহীরুহ আমরা চাই। তোমাদের কেরামতি যা কিছু সব ধরা পড়ে ফাঁস হয়ে গেছে। অতএব শনিবারের চিঠিতে সারস্বত-সাধনার পাশাপাশি সমস্ত ফাজলামি বিসর্জন দিয়ে বারাসাত না বসিরহাটে তোমাদের যে জমি আছে সেখানে কায়মনোবাক্যে আখের চাষ শুরু কর। জিনিয়াস তৈরি করতেই হবে। গোপালদা।"

কি ফল লভিনু হায়

সম্রাট নীরো, চেংগিস খান, তৈমুরলংগ, নাদির শাহের কথা মনে পড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও বিপুল সম্পত্তি নাশ করিয়া ইঁহারা পৃথিবীখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের নমস্কার। পরবর্তীকালে অ্যাটম বোমা ব্যবহারে যথেচ্ছ মানুষ মারিয়া আরও কেহ আমাদের প্রণম্য হইয়াছেন একথাও সত্য। একসময় সরিষার তেলে শিয়ালকাঁটা মিশাইয়া সহস্র সহস্র নরমেধ যজ্ঞ (প্রধানতঃ বাঙালী) আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যজ্ঞকর্তারা বর্তমানে আমাদের পরম ভক্তিভাজন। বিশেষত্ব এই, ইঁহারা ঠান্ডা ঘরে আরাম কেদারায় বসিয়া স্রেফ হুকুমের দ্বারাই ঘটনা ঘটাইয়াছেন। ভারত-বিভাগের ফলে সংঘটিত লক্ষ লক্ষ নরবলি অবশ্য একজনের দ্বারা হয় নাই -- সেক্ষেত্রে টীমওয়ার্কের ব্যবস্থা ছিল।

একেবারে সাম্প্রতিকতম স্মরণীয় ব্যক্তির কথা বলি। অসমীয়াদের চাপে পড়িয়া প্লেন-লিভিং-এর দেশ ভারতবর্ষের পাইলট শ্রীরাজীব গান্ধী নয়াদিল্লীর তখ্‌তে বসিয়া যে ফতোয়া দিয়াছেন তাহাতে দশ দশার পর শেষ পর্যন্ত যে অজস্র পরিব্রাজককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবংগের জন্য প্রেরিত নয়াদিল্লীর কর্তাদের গিফ্‌ট প্যাকেট পাইয়া আমরা স্তম্ভিত। ভারতের কোন একটি প্রদেশে ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা ফরেনার বলিয়া ঘোষিত হইবে ইহা চরম লজ্জার কথা। বাংলাদেশ হইতে আগত বিদেশীরা উপলক্ষ্য হইলেও আসামের বাঙালী মাত্রেই যে আসল লক্ষ্য, তাহাই সত্য কথা। ১.১. ৬৬, ১৯৬৮, ২৫.৩.৭১ ইত্যাদি বহুরকম তারিখ লইয়া গবেষণা আমরা দেখিলাম। এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা পরে করা হইবে।

প্রশ্ন হইতেছে, আসাম হইতে বিতাড়িত হতভাগ্য বাঙালীগণ যদি পশ্চিমবংগে বন্যাস্রোতের মত হুহু শব্দে ঢুকিয়া পড়ে তবে সে 'জলতরংগ রোধিবে কে'? ইহাদের মুখের অন্ন, থাকিবার

জায়গা জুটিবে কোথা হইতে? এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি পশ্চিমবঙ্গ জুড়িয়া বিহার উড়িষ্যা ইউপির ভাইগণকে খেদাইবার আন্দোলন শুরু হয় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না। আমরা-বাঙালী, সন্তান দল, আনন্দমার্গী, নকশালবাদীগণ যদি সিপিএম সমেত বামফ্রন্টের অন্যান্য দলের সহিত মিলিত হইয়া তলোয়ার ঘুরাইতে শুরু করে তবে কর্তাভজার দল কোথায় দাঁড়াইবে? বন্ধ অবরোধ শুরু হইলে, বলিতে লজ্জা নাই, আমরাই হয়তো গণেশ অ্যাভিনিউ, ক্যামাক স্ট্রীটের ভার লইতে পারি।

শ্রী রাজীব গান্ধীর হুকুমনামা জারি হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ইহার সশব্দ প্রতিবাদ করিয়াছেন। দায় দায়িত্ব ঝামেলা সবই তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে, তিনি উচিত কাজই করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আই-এর তরফে এই সর্বনাশা ব্যবস্থার প্রতিবাদ তো হয়ই নাই বরং সাধুবাদ সোচ্চারে প্রচারিত হইয়াছে। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হইয়া গেল। পোড়া কপাল লইয়া গঙ্গায় ডুবিতে ইচ্ছা হইতেছে।

পরম ভক্তিভরে দীর্ঘকাল গোমাতার পূজা করিয়া পরিণামে গোবৎসের লাথি খাইলাম -- অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ব্যাপার!

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীযুক্ত অজিত দাস একটি মর্মভেদী পত্রাঘাত করিয়াছেন -- হতভাগ্য সংবাদ-সাহিত্য লেখক যে কারণে প্রথমে বিমূঢ় এবং পরে লজ্জায় অধোবদন হইয়া পড়িয়াছেন। পত্রটি এই :

সম্পাদক শনিবারের চিঠি সমীপেষু,

মাননীয়,

৩ আগস্ট শনিবারের চিঠিতে সচিত্র "মহুয়ার মৃত্যু ঘিরে নানা প্রশ্ন" নামে ফিচারটি ২৬ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। কারণ, ২০ জুলাই তারিখের শ.চি.তে সংবাদ-সাহিত্য বিভাগে "নটীর পূজা" নামে লেখাটিতে মহুয়া রায়চৌধুরীর আগুনে পুড়ে যাওয়ার খবর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল বলে আপনারা আনন্দবাজারের উদ্দেশে তেত্রিশ কিলো ছয়শত গ্রাম ধিককার বাণী ছুঁড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। সত্য বলতে কি নটীর পূজা পড়ে মনে মনে আশান্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, শনিবারের চিঠি পত্রিকা হিসাবে গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্ততঃ সেই ইচ্ছাটুকু যে আছে নটীর পূজা লেখাটি পড়ে তা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! দেখা গেল যে, আপনারাও মহুয়া বনে মাতাল হওয়ার লোভ ছাড়তে পারলেন না।

কেবল ৩ আগস্ট তারিখের শ.চি.তে ২৬ ২৮ এই তিন পৃষ্ঠা খরচ করেই ক্ষান্ত হননি, ওই সংখ্যার ৪৭ পৃষ্ঠায় বিনোদন বিভাগে মহুয়াকে নানাভাবে বিকশিত করতে আরও আধ পৃষ্ঠা খরচ করেছেন এবং নীতিভ্রষ্ট হয়েছেন বলে মনে করি। কারণ, যে বিষয় অন্য কেউ ছাপলে এক সংখ্যায় ধিক্কার জানিয়ে মাঝের একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে তার পরের সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে সেই ধিক্কার বিষয়টি যদি চিত্র সহযোগে ছাপা হয় তাহলে আমাদের মত সাধারণ পাঠকের পক্ষে দিশাহারা হওয়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর আছে কি? এবং দিশাহারা হয়ে জুলিয়াস সীজারের Et tu Brute? আপ্তবাক্যটি যদি আপনার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিই তাহলে কি খুব অন্যায় করা হবে?

যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। শনিবারের চিঠি সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠুক এবং তার আগেকার চেহারা ফিরে পাক এই কামনাই করি।

নমস্কারান্তে
বিনীত,
৫-৭-৮৫ অজিত দাস।
১৬/২বি, জয়নন্দি মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা–২৭

অজিতবাবু-কৃত ন্যায়সংগত ভর্ৎসনার বিপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া খন্ডনের চেষ্টা উচিত হইবে না। তিনি যে তিরস্কারবাণী শুনাইয়াছেন তাহা শুধু কর্ণগ্রাহ্য নহে, শিরোধার্যও বটে। যেমন, মুন্সিপ্যালিটির বিচারালয়ে হুজুরের সামনে হাজির হইলে নির্দিষ্ট অপরাধ থাকুক বা না থাকুক দোষ স্বীকার করিতেই হয় নহিলে জরিমানা চতুর্গুণ হইয়া যায়, সে হেতু অজিতবাবুর কাছে ম্লানমুখে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। তাঁহার মনোবেদনা, শনিবারের চিঠির দ্বারা উত্তরোত্তর বাড়িবে বলিয়াই মনে করি। সংবাদ-সাহিত্য লেখকের রক্ষণশীল মনোভাবের পাশাপাশি এই পত্রিকার পরিবর্তনকামী ব্যবসায়ী পরিচালক-বর্গের মেজাজ বহুলাংশেই মেলে না। মেলানো কঠিন। অতএব নিরুপায় অবস্থায় স্বকৃত পাপের জন্য পত্রলেখকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ষোল আনা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গঙ্গাজল গোবর ভক্ষণের পরিবর্তে অতঃপর সংবাদ-সাহিত্য লেখা বন্ধ করিলাম। অজিতবাবুর অনুমতি না মিলিলে কদাচ লিখিব না। অলমতিবিস্তরেন। □

শনিবারের চিঠি

নিয়মাবলী

এজেন্টদের জন্য :

- **কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় এজেন্সি দিতে আমরা ইচ্ছুক।**
- **এজেন্টরা চিঠি লিখলে আমাদের ছাপানো নিয়মাবলী পাঠানো হবে।**

বিজ্ঞাপনের হার

	স্বাভাবিক হার	চুক্তি অনুসারে হার
এক পাতা	২,০০০/-	১,৮০০/-
আধ পাতা	১,২০০/-	১,০০০/-
১/৪ পাতা	৭৫০/-	৬০০/-
এক কলাম	৭৫০/-	৬০০/-
১/২ কলাম	৪০০/-	৩৫০/-
চতুর্থ মলাট (চার রঙ)	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
ভেতরের দ্বিতীয় মলাট (সাদা কালো)	২,৫০০/-	২,২০০/-

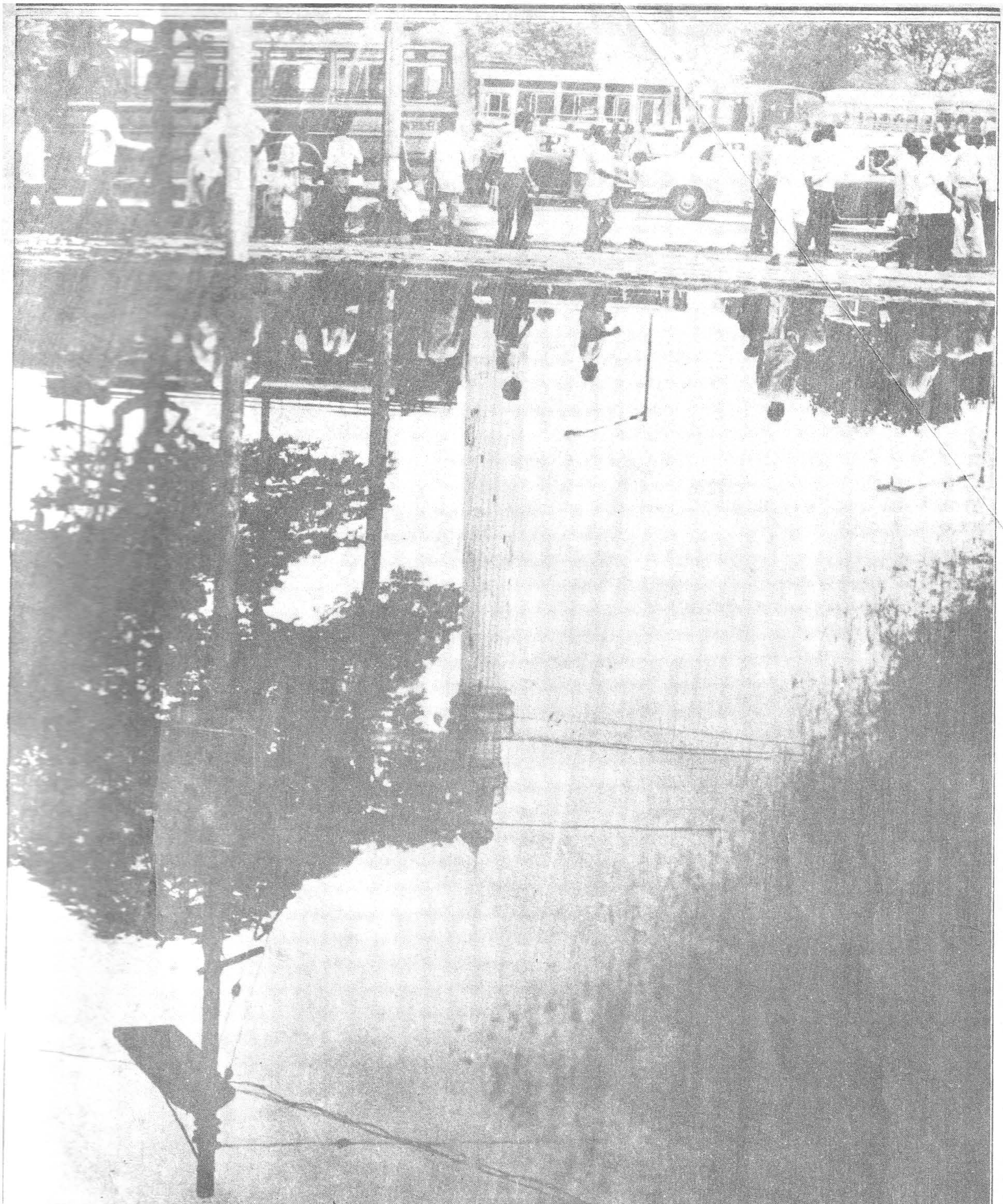

কলকাতাঃ একটু জলেই ডুবুডুবু শহরের জলছবি

ছবিঃ দিলীপ শেঠ

SANIBARER CHITHI □ VOL 1 NO 45 □ AUGUST 31 Regn. No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram CENTPILES, Telex CENT IN CA-021-2331
Phones 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554